Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট,

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ হীরা খাতুন

রোলঃ 23090120057

২০শে নভেম্বর, ২০২৫ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট,

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ হীরা খাতুন

রোলঃ 23090120057

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছাঃ হীরা খাতুন, আইডিঃ 23090120057 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা"** শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতী জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

হীরা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০শে নভেম্বর, ২০২৫ ইং

মোছাঃ হীরা খাতুন

আইডিঃ 23090120057

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

সাহাবায়ে কেরামের পরিচয় 7

সাহাবিদের সংখ্যা 11

সাহাবী চেনার উপায় 13

সাহাবীদের যুগ 14

সাহাবায়ে কেরামের তাবাকা বা শ্রেণি 15

সাহাবায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য 19

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা 29

সাহাবীদের মর্যাদাগত স্তর 32

সাহাবীদের মর্যাদা 43

নারী সাহাবীদের মর্যাদা 79

পবিত্র কুরআনে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা 96

হাদীসে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা 98

সাহাবায়ে কেরামের বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত 100

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আমাদের করনীয় 101

উপসংহার 103

গ্রন্থপঞ্জিকা 104

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা শুধু আল্লাহ তাআলার তাঁর কাছেই আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি। কুপ্রবৃত্তি এবং মন্দ কর্মের অকল্যাণ থেকে আমরা পানাহ চাই আল্লাহর কাছেই। তিনি যাকে হেদায়েত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা। আর যাকে তিনি পথ দেখান না কেউ তাকে পথ দেখাতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তাঁর কোন অংশীদার নৈই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। আর শান্তি বর্ষিত হউক তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সকল সাহাবীদের প্রতি।

আমাদের জীবন শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। পৃথিবীর এ সংক্ষিপ্ততম নীড়ে আল্লাহর হুকুম মেনে চলে জান্নাত নামক মহাপুরস্কার লাভ করাই প্রকৃত সফলতা। তবে আমরা জানি না কীভাবে তার হুকুম মানতে হয়।

পৃথিবী নামের গ্রহে আমাদের অবস্থানকে সফল করতে আল্লাহ তায়ালা নবী-রাসুলদের পাঠিয়েছিলেন। তার মাধ্যমে আমাদের দিয়েছেন আসমানি কিতাবসমূহ। নবীর সাহাবীগণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন শরিয়তের বাস্তব প্রয়োগ।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে দীনের বিধানাবলি পালনে সাহাবীগণই প্রকৃত মানদণ্ড। তারা যেভাবে দীন পালন করেছেন, সেভাবে পালন করতে পারলেই আমরা পৌছে যাব আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যপানে। কুরআন ও সুন্নাহ এ সাহাবীদের মর্যাদা সম্পর্কে ব্যাপক ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। দুনিয়া ও আখেরাতে সাহাবীদের মর্যাদা অধিক উচ্চতর স্থানে উন্নীত করা হয়েছে। তাঁরা উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ। তাঁরা সকল কিতাবে আলোচিত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

ۡ وَرِضۡوَانًا اللّٰهِ مِّنَ فَضۡلًا يَّبۡتَغُوۡنَ سُجَّدًا رُّكَّعًا تَرٰىهُمۡ بَيۡنَهُمۡ رُحَمَآءُ الۡكُفَّارِ عَلَي اَشِدَّآءُ مَعَهٗۚ وَالَّذِيۡنَ ۚ اللّٰهِ رَّسُوۡلُ مُحَمَّدٌ فَاٰزَرَهٗ شَطۡـَٔهٗ اَخۡرَجَ كَزَرۡعٍ ۛۚ الۡاِنۡجِيۡلِ فِي وَمَثَلُهُمۡ ۛۚ التَّوۡرٰىةِ فِي مَثَلُهُمۡ ذٰلِكَ ۚ السُّجُوۡدِ اَثَرِ مِّنۡ وُجُوۡهِهِمۡ فِيۡ سِيۡمَاهُمۡ مَّغۡفِرَةً مِنۡهُمۡ الصّٰلِحٰتِ وَعَمِلُوا اٰمَنُوۡا الَّذِيۡنَ اللّٰهُ وَعَدَ ۙ الۡكُفَّارَ بِهِمُ لِيَغِيۡظَ الزُّرَّاعَ يُعۡجِبُ سُوۡقِهٖ عَلٰي فَاسۡتَوٰي فَاسۡتَغۡلَظَ عَظِيۡمًا وَّاَجۡرًا

“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকূকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার

চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি চারাগাছের মত, যে তার কঁচিপাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কান্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষীকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন।" (সূরা আল-ফাতহ, আয়াতঃ ২৯)

সাহাবায়ে কেরামের পরিচয়

“সাহাবা” (صاحب) শব্দের বহুবচন হলো ‘আসহাব’ (الصحابة)। ‘সাহাবা’ শব্দের আভিধানিক অর্থ সহচর, সঙ্গী বা সাথি, একসাথে জীবন যাপনকারী অথবা সাহচর্যে অবস্থানকারী। ইসলামি পরিভাষায় 'সাহাবা' শব্দটি দ্বারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গী-সাথীদের বোঝায়। আর ‘সাহাবিয়া’ শব্দের অর্থ নারী সাহাবি।

সাহাবীগন হলেন তারা, যারা রাসূল (সাঃ) কে পেয়েছেন, তাঁর রিসালাতের ওপর ঈমান এনেছেন, তাঁকে ভালোবেসেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন।

সাহাবীদের পরিচয় দিতে গিয়ে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারি (রহ.) বলেছেন-
“যারা রাসূলে পাক (সাঃ) কে দেখেছেন এবং মুসলিম হিসেবে তাঁর সাথে ছিলেন, তাঁরাই সাহাবি।”

ইবন কাসীর (রহ.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মুসলিম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে দেখেছেন তিনিই সাহাবী; যদিও তার দীর্ঘ সাহচর্য নেই বা তাঁর থেকে কোন হাদিস বর্ণনা করেননি।’ এটি সৎপূর্বসূরী ও উত্তরসূরী সব আলেমের অভিমত। (ইখতিসারু ‘উলুমিল হাদিস মা‘ আল-বা‘ইস আল-হাসীস, ১/৪৯১।)

ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেছেন, ‘যে কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাহচর্যে একবছর বা একমাস বা একদিন বা এক ঘন্টা ছিল বা এক মুহূর্ত তাঁকে দেখেছেন তিনি তাঁর সাহাবী। সাহচর্যের সময় অনুপাতে তাদের সাহাবীত্বের মর্যাদা নির্ণয় করা হবে।’ (আল-কিফায়া ফি ইলমির রিওয়াইয়া, পৃষ্ঠা ৫১।)

ইমাম বুখারী রহ. তার সহীহ বুখারীতে বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন অথবা যে মুসলিম তাঁকে দেখেছেন তিনি সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত।’

মুহাদ্দিসগণের মতে:

وسلم عليه الله صلى الله رسول رأى مسلم كل هو

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন-এমন প্রত্যেক মুসলিম সাহাবী বলে গণ্য।"

হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.) (৮৫২ হিজরি) 'আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস' সাহাবা গ্রন্থে সাহাবীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

الصَّحَابِيَّ إِنَّ: مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ مُؤْمِنًا بِهِ، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ

'সাহাবী সেই ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান সহকারে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপরই মৃত্যুবরণ করেছেন। (ইবনে হাজর আল-আসকলানী, আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা, খ. ১, পৃ. ১৫৮)

উপর্যুক্ত সংজ্ঞায় সাহাবী হওয়ার জন্য তিনটি শর্তারোপ করা হয়েছে। যথা-

১. রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান,
২. আল-লিকাঃ ঈমানের অবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ও
৩. মাওত 'আলাল ইসলামঃ ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ।

প্রথম শর্তঃ

যাঁরা রাসূল (সাঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন কিন্তু তাঁর উপর ঈমান আনেননি, তাঁরা সাহাবী হিসাবে গণ্য হবে না। যেমনঃ আবু জাহল, আবু লাহাব প্রমুখ সে সময়ের মক্কার কাফেরবৃন্দ।

দ্বিতীয় শর্তঃ

আল-লিকাঃ যাঁরা ঈমানের ওপর থাকা অবস্থায় রাসূল (সাঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন কিন্তু অন্ধত্ব বা এ ধরনের কোন কারণে তাঁকে নিজ চোখে দেখতে পারেননি, তাঁরা সাহাবী হিসাবে গণ্য হবেন। যেমনঃ অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাখতুম (রাঃ)।

তৃতীয় শর্তঃ

মাওত 'আলাল ইসলামঃ যাঁরা ঈমানের সহিত রাসূল (সাঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, কিন্তু পরে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গিয়েছেন। অতঃপর পূনরায় মুসলমান হয়ে ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এ দ্বিতীয় বার ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (সাঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ না করলেও তাঁরা সাহাবী বলে পরিগণিত হবেন। যেমনঃ হযরত আশয়াস ইবনে কায়েস (রাঃ)। তিনি ইসলাম গ্রহনের পর মুরতাদ হয়ে যান। এরপর হযরত আবু বকর (রাঃ) এর

খিলাফতকালে পূণরায় ইসলাম গ্রহণ করেন। হাদিস বিশারদগণ তাঁকে সাহাবি হিসেবে গণ্য করে তাঁর বর্ণিত হাদিস সহীহ ও মুসনাদ গ্রন্থসমূহে সংকলন করেছেন।

তৃতীয় শর্তের ওপর ভিত্তি করে এমন ব্যক্তি সাহাবী হিসেবে গণ্য হবে না, যিনি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, কিন্তু পরে মুরতাদ অবস্থায় মারা গেছেন। যেমনঃ আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ আল-আসাদী। তিনি মুসলমান হয়ে হাবশায় হিজরত করার পর খ্রিস্টান হয়ে যান এবং সেখানেই মুরতাদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। এছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে খাতাল, রাবীয়া ইবনে উমাইয়া প্রমুখ মুরতাদ ব্যক্তিবর্গ সাহাবী নন। কারণ সাহাবী হওয়ার জন্য ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করার শর্তটি উক্ত ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

সুতরাং, যাঁরা ঈমানের সহিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের পর সামান্য সময়ের জন্য হলেও তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর থেকে কোনো হাদিস বর্ণনা করুক বা না করুক, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুক বা না করুক, এমন কি যে ব্যক্তির সাথে মুহূর্তের জন্য হলেও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়েছে এবং ঈমানের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন, এমন সকলেই সাহাবী হিসেবে গণ্য হবেন।

আবার যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনেনি, কিন্তু পূর্ববর্তী অন্য কোনো নবীর প্রতি ঈমান সহকারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছে তারা সাহাবী নয়। বুহাইরা রাহিবের মতো যাঁরা পূর্ববর্তী কোনো নবীর প্রতি ঈমান সহকারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন, তিনি ভবিষ্যতে নবী হবেন এমন ব্যক্তিদের সাহাবী হওয়ার বিষয়ে মুসলিম মনীষীরা কোনো সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতে পারেননি।

যদি কোনো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তিকালের পর দাফনের পূর্বে তাকে দেখে থাকেন, যেমনটি ঘটেছিল প্রখ্যাত আরবি কবি আবু জুয়ারিব আল-হুজালীর ক্ষেত্রে। তাহলে এ ব্যাপারে আলেমদের মতবিরোধ থাকলেও গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে, এমন ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামের অন্তর্ভূক্ত হবেন না।

উপরে উল্লেখিত শর্তাবলি জিনদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জিনরাও 'সাহাবা' ছিলেন। কুরআন মাজিদে এমন কিছু জিনের কথা বলা হয়েছে যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কুরআন তিলাওয়াত শুনে ঈমান এনেছিলেন।

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহ.) বলেন,

الصَّحَابِيُّ مَنْ أَقَامَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ، وَغَزَا مَعَهُ غَزْوَةً أَوْ غَزْوَتَيْنِ.

'সাহাবী হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, এক বা দু'বছর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহচর্য অথবা তাঁর সাথে দু'একটি গাযওয়া বা যুদ্ধে অংশগ্রহণ।' (আল-খতীবুল বাগদাদী, আল-কিফায়া ফী মা'রিফাতি উসূলি 'ইলমির রিওয়ায়া, পৃ. ৫০)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্য বা 'সুহবত' এর মর্যাদার সমকক্ষ আর কোনো মর্যাদা মুসলমানদের জন্য নেই। সুহবতের মর্যাদা ছাড়াও দ্বীনের ভিত্তিকে শক্তিশালী ও মজবুত করা, ইসলামের তাবলীগ ও শরীয়তের খেদমতের ক্ষেত্রে কঠোর শ্রমদান ও আত্মত্যাগের কারণে প্রতিটি মুসলমানের কাছে সাহাবায়ে কেরামের একটি পবিত্র ও উচ্চ মর্যাদা আছে।

সাহাবীরা এমন মানুষ যাঁরা জাহিলিয়াতের অতল তিমিরে নিমজ্জিত ছিল, আবার তাঁরাই রাসূল (সাঃ) এর পবিত্র সাহচার্য পেয়ে, নববি জিয়ন কাঠির ছোঁয়ায় পরিণত হয়েছেন মানবেতিহাসের শ্রেষ্ঠ প্রজন্মে! তারা পরিণত হলেন এমন পরশ পাথরে যার উজ্জ্বলতার আলোকচ্ছটা ঠিকরে পড়েছে আরবের অলিগলি পেরিয়ে তামাম পৃথিবীর দুয়ারে দুয়ারে।

সাহাবিদের সংখ্যা

রাসূল (সাঃ)-এর কতজন সাহাবী ছিলেন তার প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ করা অনেক কঠিন বিষয়। কেননা রাসূল (সাঃ)-এর রেসালাতি যুগে অগণিত লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন।

ইমাম আবু যার'আ আর-রাযী (রহ.) বলেছেন-

عَنْهُ رَوَى قَدْ كُلُّهُمْ امْرَأَةٍ، أَوِ رَجُلٍ مِّنْ إِنْسَانٍ أَلْفِ مِائَةِ عَلَى زِيَادَةٌ مِنْهُ وَسَمِعَ رَآهُ وَمَنْ ﷺ النَّبِيُّ تُوُفِّيَ رُؤْيَةً أَوْ سَمَاعًا.

'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন ইনতিকাল করেন, তখন যারা তাঁকে দেখেছেন এবং তাঁর কথা শুনেছেন এমন লোকের সংখ্যা নারী-পুরুষ মিলে এক লাখেরও ওপরে। তাঁদের প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদিস বর্ণনা করেছেন। (ইবনে হাজর আল-আসকলানী, আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা, খ. ১, পৃ. ১৫৪)

তাহলে যে সকল সাহাবী কোনো হাদিস বর্ণনা করেননি তাঁদের সংখ্যা যে কত বিপুল তা সহজেই অনুমেয়। ইমাম আবু যার'আ (রহ.)-এর এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রাযি.)-এর একটি বক্তব্য দ্বারা। তিনি তাবুক অভিযান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন-

دِيْوَانٌ يُحْصِيْهِمْ لَا كَثِيْرٌ، وَالنَّاسُ

'মানুষের সংখ্যা অনেক। কোনো দফতর বা দিওয়ান তা গণনা করতে পারবে না।' ((ক) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২১২৯, হাদিস: ২৭৬৯; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা, খ. ১, পৃ. ১৫৫)

আল্লামা ইবনে আসির জাজারি (রহ.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ উসদুল গাবাহতে লিখেছেন,

العلماء ذكره من اضعاف لكانوا الزمان ذلك حفظوا لو و

'সে সময় সাহাবিরাই যদি অন্যান্য সাহাবিদের নাম সংরক্ষণ করতেন, তাহলে তাদের সংখ্যা আলেমদের বর্ণিত সংখ্যার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি হতো।' (উসদুল গাবাহ: ১/০৩)

উসদুল গাবাহর গ্রন্থকার লিখেছেন, দ্বীনি বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে খোদ সাহাবিদের পক্ষেই তাদের কাফেলার পূর্ণ সদস্যসংখ্যা গণনা করে রাখা সম্ভব হয়নি। (মুকাদ্দামায়ে উসদুল গাবাহ: ০৩)

সূতরাং সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা অগনিত। তাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে নির্ণয় করা অসম্ভব। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনের শেষ দিকে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর হাতে বায়আত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, হিজরী দশম সনে মক্কা এবং তায়েফে একজনও অমুসলিম ছিল না। সকলে ইসলাম গ্রহণ করে বিদায় হজে অংশগ্রহণ করে। এমনিভাবে আরবের বহু গোত্র সম্পূর্ণভাবে মুসলমান হয়ে যায়। তাদের অধিকাংশ ছিল মরুবাসী বেদুঈন। তাদের হিসেব সংরক্ষণ করা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। তাছাড়া হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর খিলাফতকালে ভণ্ড নবী ও ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযানকালে অসংখ্য সাহাবী শাহাদত বরণ করেন। তাঁদের অনেকের পরিচয় ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। (ইবনে হাজর আল-আসকলানী, আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা, খ. ১, পৃ. ১৫৫)

সাহাবী চেনার উপায়

কে সাহাবী এবং কে সাহাবী নয় তা নির্ণয় করার জন্য রিজাল ও হাদিসশাস্ত্র বিশারদগণ কতিপয় মূলনীতির অনুসরণ করেছেনঃ

১. **খবরে তাওয়াতুরঃ** অর্থাৎ একজন মানুষ সম্পর্কে যখন প্রতিটি যুগের অসংখ্য মানুষ বর্ণনা বা সাক্ষ্য দেবে যে তিনি সাহাবী ছিলেন। সাইয়্যেদুনা আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলি (রাঃ) এবং সকল প্রখ্যাত সাহাবীগণের সাহাবী হওয়া এ পদ্ধতিতেই প্রমাণিত।

২. **খবরে মাশহুরঃ** অর্থাৎ প্রতিটি যুগের প্রচুরসংখ্যক মানুষ সাক্ষ্য দেবে যে, অমুক সাহাবী। উকাশা ইবনে মিহসান এবং জিমাম ইবনে সালাবা (রাঃ)-এর সাহাবী হওয়া এই পদ্ধতিতে প্রমাণিত।

৩. কোনো একজন সাহাবীর বর্ণনা বা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সাহাবী বলে প্রমানিত হতে হবে।

৪. কোনো একজন প্রখ্যাত তাবেয়ীর বর্ণনা বা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সাহাবী হিসেবে প্রমানিত হতে হবে।

৫. কেউ নিজেই যদি দাবি করেন যে, তিনি সাহাবী। তাহলে সে ক্ষেত্রে তার মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য আছে কিনা তা দেখতে হবে। যথা-

১. **আদালত বা ন্যায়নিষ্ঠতা:** এটি সাহাবায়ে কেরামের বিশেষ গুণ। সাহাবিয়াতের দাবিদার ব্যক্তির মধ্যে এ গুণটি অবশ্যই থাকতে হবে।

২. **মু'আসিরাত বা সমসাময়িকতা:** সাহাবায়ে কেরামের যুগ শেষ হয়েছে হিজরী ১১০ সনে। কারণ রাসূল (সাঃ) তাঁর ইনতিকালের একমাস পূর্বে বলেছিলেন,

أَحَدٌ عَلَيْهَا الْيَوْمَ هُوَ مِمَّنْ الْأَرْضِ وَجْهِ عَلَى يَبْقَى لَا مِّنْهَا، سَنَةٍ مِائَةِ رَأْسَ عَلَى فَإِنَّ هَذِهِ، لَيْلَتَكُمْ أَرَأَيْتَكُمْ

'আজ এ পৃথিবীতে যারা জীবিত আছে আজ থেকে একশ' বছর পর তারা কেউ জীবিত থাকবে না।"

সুতরাং হিজরী ১১০ সনের পর কেউ জীবিত থাকলে এবং সে সাহাবী বলে দাবি করলে রিজালশাস্ত্র বিশারদরা তাকে সাহাবী বলে মেনে নেননি। অনেকে এমন দাবি করেছিলেন; কিন্তু সে দাবি মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে।

ষষ্ঠ হিজরিতে রতন হিন্দি নামে এক ব্যক্তি সাহাবী হওয়ার দাবি করেছিল। কিন্তু মুহাদ্দিসরা শক্ত ভাষায় তার এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন। শুধু তা-ই নয়, তাকে চরম মিথ্যুক ও প্রতারক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

সাহাবীদের যুগ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় থেকে শুরু হয়ে সাহাবায়ে কেরামদের যুগের ব্যাপ্তি ছিল হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত। আর এর মাধ্যমেই প্রতিভাত হয়েছিল নবীজি (সাঃ) এর অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণী। তাঁর পবিত্র জবানে উচ্চারিত হয়েছিল:

أَحَدٌ الْأَرْضِ ظَهْرِ عَلَى هُوَ مِمَّنْ يَبْقَى لَا مِنْهَا سَنَةٍ مِائَةِ رَأْسِ عَلَى فَإِنَّ

"যাঁরা আজ পৃথিবীতে আছে, আগামী একশো বছর পর তাদের কেউ-ই জীবিত থাকবে না।" (সহিহ বুখারি: ৬০১)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, "রাসূলের পবিত্র জবান থেকে এমন বাক্য শোনার পর সাহাবায়ে কেরাম দ্বিধায় পড়ে যান। মূলত এর দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন, সাহাবিযুগের পরিসমাপ্তি ঘটবে।" [সহিহ বুখারি: ৬০১, কিতাবু মাওয়াকিতিস সালাহ, এশার পর কথা বলা প্রসঙ্গ; মুসনাদে আহমাদ: ৬০২৮; সহিহ মুসলিম: ৬৪৮০ (২৫৩৭)]

সাহাবায়ে কেরামের জীবনী ও তাদের সময়কাল পর্যালোচনা করে আমাদের নিকট রাসূল (সাঃ) এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা দিবালোকের ন্যায় ফুটে ওঠে। ৮৮ হিজরি, মতান্তরে ৯১ হিজরিতে মদিনার সাহাবীদের মধ্যে সর্বশেষ ইন্তেকাল তখনই তিনি সম্পূর্ণ সুরা মুখস্থ করে ফেলেন এবং একপর্যায় মুসলমান হয়ে যান। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/৩৩৫ (১৮৯৫৮)]

এ ছাড়াও অনেক সাহাবী কুরআনের প্রভাবেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কুরআনের আয়াত তাদের হৃদয়ে এনেছিল হেদায়াতের নুর। আবু উবাইদা (রাঃ), আবু সালামা (রাঃ), আরকাম ইবনে আবু আরকা (রাঃ) এবং উসমান ইবনে মাজউন (রাঃ) এর মতো সাহাবীরা রাসূল (সাঃ) এর কাছে এসেছিলেন। রাসূল তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তাদেরকে শুনিয়েছিলেন কুরআনের শাশ্বত বাণী। ফলশ্রুতিতে তাদের হৃদয় হয়ে উঠেছিল ইসলামের বরকতে আলোকিত, আলোড়িত। (উসদুল গাবাহ, তাজকিরাতু আবু সালামা ইবনে আবদিল আসাদ।)

সাহাবায়ে কেরামের তাবাকা বা শ্রেণি

মুহাম্মাদ ইবনে সা'আদ সাহাবায়ে কেরামের পাঁচটি তাবাকার কথা বলেছেন। তবে উলামায়ে কেরাম সাহাবীদের বারোটি তাবাকার আলোচনা করেছেন। আবার কেউ কেউ এর বেশিও বলেছেন। ইসলাম গ্রহনের অগ্রগামিতা, হিজরত এবং জিহাদের ময়দানে অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিবেচনায় সাহাবায়ে কেরামকে যে ১২ টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে, নিম্নে সংক্ষেপে তার বিবরণ তুলে ধরা হলোঃ

প্রথম তাবাকাঃ যে সকল সাহাবী একদম শুরুতে মক্কায় ইসলাম গ্রহন করেছিলেন, তাঁরাই হলেন প্রথম স্তরের সাহাবী। প্রথম তাবাকার সাহাবীগণ হলেনঃ হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)।

দ্বিতীয় তাবাকাঃ দ্বিতীয় তাবাকার সাহাবীগণ হলেন দারুন নাদওয়াতে ইসলামের বাইয়াতকারী সাহাবীগণ। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) যখন ইসলাম গ্রহন করেন ও প্রকাশ্যে তাঁর ইসলাম গ্রহনের কথা ঘোষণা করেন, তখন তাঁকে দারুন নাদওয়ায় রাসূল (সাঃ) এর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর তিনিসহ মক্কার একদল সাহাবী রাসূল (সাঃ) এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন।

তৃতীয় তাবাকাঃ যে সমস্ত মুহাজির সাহাবী হাবশায় হিজরত করেছিলেন, তাঁরা তৃতীয় তাবাকার অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ তাবাকাঃ যে সকল সাহাবী প্রথম আকাবায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা চতুর্থ তাবাকার অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম তাবাকাঃ পঞ্চম তাবাকার সাহাবীগণ হলেন তাঁরা, যাঁরা দ্বিতীয় আকাবায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাদের বেশিরভাগ ছিল মদীনার আনসার সাহাবী।

ষষ্ঠ তাবাকাঃ এ তাবাকার সাহাবীগণ হলেন মুহাজির সাহাবী। তাঁরা প্রথমভাগে মদীনায় হিজরত করেন। তাঁরা কুবায় রাসূল (সাঃ) এর সাথে মিলিত হয়েছিলেন, যখন তিনি সেখানে মসজিদ নির্মাণ করছিলেন।

সপ্তম তাবাকাঃ সপ্তম তাবাকার সাহাবীগণ হলেন, ঐ সকল সাহাবী, যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ সকল সাহাবীর ব্যাপারপ রাসূল (রাঃ) বলেছেন-

لَكُمْ غَفَرْتُ فَقَدْ شِئْتُمْ مَا اعْمَلُوا فَقَالَ بَدْرٍ أَهْلِ عَلَى اطَّلَعَ وَجَلَّ عَزَّ اللَّهَ لَعَلَّ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন এবং তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, তোমরা যা ইচ্ছা করতে পার। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৪৬০৮)

অষ্টম তাবাকাঃ অষ্টম তাবাকার সাহাবীগণ হলেন ঐ সমস্ত সাহাবীগণ যাঁরা বদর যুদ্ধ ও হুদায়বিয়ার সন্ধির মধ্যবর্তী সময়ে মদীনায় হিজরত করেন।

নবম তাবাকাঃ নবম তাবাকার সাহাবীগণ হলেন বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণ কারী সাহাবীগণ। যখন মক্কার কাফিরগণ কর্তৃক রাসূল (সাঃ) ওমরাহ পালনে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখন হুদায়বিয়া নামক স্থানে বাইয়াতে রিদওয়ান অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সকল সাহাবীর ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে সূরা আল-ফাতহ এর ১৮ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَاَثَابَهُمْ عَلَيْهِمْ السَّكِيْنَةَ فَاَنْزَلَ قُلُوْبِهِمْ فِيْ مَا فَعَلِمَ الشَّجَرَةِ تَحْتَ يُبَايِعُوْنَكَ اِذْ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنِ اللّٰهُ رَضِيَ لَقَدْ قَرِيْبًا فَتْحًا

“অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাই’আত গ্রহণ করেছিল; অতঃপর তিনি তাদের অন্তরে কী ছিল তা জেনে নিয়েছেন, ফলে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন নিকটবর্তী বিজয় দিয়ে।”

দশম তাবাকাঃ যে সকল মুহাজির সাহাবীগণ হুদায়বিয়ার সন্ধির পর থেকে মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে মদীনায় হিজরত করেন সে সকল সাহাবীগণ নবম তাবাকার অন্তর্ভুক্ত। এ সকল সাহাবীগণ হলেন বীর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ, আমর ইবনুস আস, আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ।

একাদশ তাবাকাঃ মক্কা বিজয়ের সময় যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন তারা এই তাবাকার অন্তর্ভুক্ত। এই সকল সাহাবীর মধ্যে কুরাইশদের একটু বড় দল শামিল ছিল।

দ্বাদশ তাবাকাঃ যে সকল শিশু ও বালক মক্কা বিজয় ও বিদায় হজ্জের সময় রাসূল (সাঃ) কে দেখেছিলেন তারা দ্বাদশ তাবাকার অন্তর্ভুক্ত। এদের মাঝে ছিলেন সায়েব ইবনে ইয়াযীদ, আবদুল্লাহ ইবনে সালাবা। এই দুইজন রাসূল (সাঃ) এর দরবারে এলে তিনি তাদের জন্য দু'আ করেছিলেন। এছাড়াও তাদের মধ্যে আরও ছিলেন আবুত তুফাইল আমের ইবনে ওয়াসেলাহ এবং আবু জুহাইফা ওয়াহাব ইবনে আবদুল্লাহ। তাঁরা দ'জন প্রিয় নবীকে তাওয়াফের সময় ও যমযমের নিকট দেখেছিলেন।

এছাড়াও সাহাবীগণের স্তরকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যাসের বিষয়টিও প্রসিদ্ধ:
প্রথম স্তর: এ স্তরে আছেন বড় বড় সাহাবীগণ। যেমনঃ জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জন সাহাবী এবং শুরুর দিকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণ।

দ্বিতীয় স্তর: মধ্যম স্তরের সাহাবীগণ।

তৃতীয় স্তর: তৃতীয় স্তরে আছেন ছোট স্তরের সাহাবীগণ, যাঁরা দেরিতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন অথবা যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সময়ে ছোট ছিলেন।

যদিও সাহাবায়ে কেরামকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে এবং তাদের মান-মর্যাদার মাঝেও তারতম্য রয়েছে, যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত; কিন্তু তাঁরা সকলেই ন্যায়পরায়ণ এবং নবীগণের পরে তাঁরা দুনিয়ার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাদের সকলের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে উত্তম ও কল্যাণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।
আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاَعَدَّ عَنْهُ وَرَضُوْا عَنْهُمْ اللّٰهُ رَّضِيَ ۚ بِاِحْسَانٍ اتَّبَعُوْهُمْ وَالَّذِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الْمُهٰجِرِيْنَ مِنَ الْاَوَّلُوْنَ وَالسّٰبِقُوْنَ
الْعَظِيْمُ الْفَوْزُ ذٰلِكَ ۚ اَبَدًا فِيْهَآ خٰلِدِيْنَ الْاَنْهٰرُ تَحْتَهَا تَجْرِيْ جَنّٰتٍ لَهُمْ

"আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।" (সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০০)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

قَبْلِ مِنْ اَنْفَقَ مَّنْ مِنْكُمْ يَسْتَوِيْ لَا ۗ وَالْاَرْضِ السَّمٰوٰتِ مِيْرَاثُ وَلِلّٰهِ اللّٰهِ سَبِيْلِ فِيْ تُنْفِقُوْا اَلَّا لَكُمْ وَمَا وَاللّٰهُ ۗ الْحُسْنٰى اللّٰهُ وَّعَدَ وَكُلًّا ۗ وَقٰتَلُوْا بَعْدُ مِنْۢ اَنْفَقُوْا الَّذِيْنَ مِّنَ دَرَجَةً اَعْظَمُ اُولٰۤئِكَ ۗ وَقٰتَلَ الْفَتْحِ خَبِيْرٌ تَعْمَلُوْنَ بِمَا

“তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করছ না? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকারতো আল্লাহরই? তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তারা সমান নয়। তারা মর্যাদায় তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যারা পরে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ প্রত্যেকের জন্যই কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আর তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবগত।” (সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ১০)

সাহাবায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য

নবি কারিম (সাঃ) এর পর উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম হলেন সাহাবায়ে কেরাম। কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমগ্র মানুষের জন্য তাঁরা সত্যের মাপকাঠি। তাঁরা অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, যা তাদের অন্যান্য সকল প্রজন্ম থেকে করেছে আলাদা। তাঁদের উন্নত চরিত্রের ঘ্রান পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিলে সমস্ত সৃষ্টিকুল সেই ঘ্রানে মাতোয়ারা হয়ে উঠবে। মানবতার বিশাল আকাশে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অসংখ্য তারকার ভিড়ে সাহাবায়ে কেরাম যেন পূর্ণ বিলশিত চাঁদ। তাঁদের জীবনের ছোট থেকে বড়, অসাধারণ থেকে সাধারণ সবকিছুই বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। নিচে সাহাবীদের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলোঃ

দৃঢ় ঈমানঃ

সাহাবীদের ঈমান সম্পর্কে কুরআনে অসংখ্য আয়াত বর্ণিত হয়েছে। শুধু সুরা আনফালেই প্রায় ২০ জায়গায় সাহাবীদের ঈমানের কথা আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

بَدَّلُوْا وَمَا ۖ يَّنْتَظِرُ مَّنْ وَمِنْهُمْ نَحْبَهٗ قَضٰي مَّنْ فَمِنْهُمْ ۚ عَلَيْهِ اللّٰهَ عَاهَدُوا مَا صَدَقُوْا رِجَالٌ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ تَبْدِيْلًا

মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত তাদের প্রতিশ্রুতি সত্যে বাস্তবায়ন করেছে। তাদের কেউ কেউ [যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে] তার দায়িত্ব পূর্ণ করেছে, আবার কেউ কেউ [শাহাদাত বরণের] প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা (প্রতিশ্রুতিতে) কোন পরিবর্তনই করেনি। (সূরা আল-আহযাব, আয়াতঃ ২৩)

তাঁদের জীবনের সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করার নিয়ামক শক্তির নাম 'ঈমান'। সবখানে ছিল ঈমানের দীপ্ত ছাপ। তাঁদের ঈমানের দৃঢ়তা ছিল অবিশ্বাস্য রকমের। অসহনীয় কষ্ট আর সীমাহীন ভয়ের সম্ভাবনা-কোনো কিছুই তাঁদের ঈমানের দেওয়ালে চিড় ধরাতে পারেনি। তাঁদের বুকের ওপর জগদ্দল পাথর চাপা দেওয়া হয়েছে। টেনে-হিঁচড়ে তাঁদের পিঠের রক্ত দিয়ে মরুবালুকে রক্তিম করা হয়েছে। ধনীর আদরের দুলাল মুসআবকে করা হয়েছে ত্যাজ্য পুত্র! সবচেয়ে দামি আতর ব্যবহারকারী মুসআব বেছে নিলেন মুসাফিরি জীবন! সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম নেওয়া মুসআব ইবনে উমাইর সব ছেড়ে দিলেও ঈমান ছাড়েননি।

তাঁদের অঙ্গ কেটে পৃথক করা হয়েছে, জলন্ত কয়লার ওপর ফেলে দেওয়া হয়েছে, শুলিতে বসিয়ে তির নিক্ষেপ করা হয়েছে, রক্ত দিয়ে তৃষিত মরুভুমি সিক্ত করা হয়েছে, জবাই করা

প্রাণীর মতো ছটপট করতে করতে তাঁদের প্রাণ নিঃশেষ হয়েছে, কিন্তু তাঁরা ঈমান বিসর্জন দেননি।

তাঁদের ঈমান ছিল পর্বতপ্রমাণ। কাতাদা (রহ.) যখন আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে সাহাবিদের ঈমানের বৈশিষ্ট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি বলেন-

الْجِبَالِ مِنَ أَعْظَمُ قُلُوبِهِمْ فِي الْإِيمَانُ

"তাঁদের হৃদয়ে ঈমান পাহাড়ের চেয়েও সুদৃঢ় ছিল।" (মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক: ২০৬৭১)

সাহাবিদের পুরো জীবনটাই ছিল অটল ঈমানের প্রতিচ্ছবি। ইবাদত-বন্দেগি, লেনদেন, চলাফেরা, আখলাক-চরিত্র, জীবনের সর্বত্র ছিল তাঁদের সুদৃঢ় ঈমানের পরিপূর্ণ ছাপ।

সাদ ইবসে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) তাঁর মাকে খুবই ভালোবাসতেন। তিনি মায়ের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ও সদাচারী ছিলেন। সাদ ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর মা তাঁকে বললেন-'তুমি এ কী দ্বীন গ্রহণ করেছ? তুমি তা ত্যাগ করো, নতুবা আমি পানাহার ছেড়ে দেবো। আমি না খেয়ে মারা গেলে মানুষ তোমাকে মাতৃহন্তা বলবে।' সাদ (রাঃ) বললেন-

لِشَيْءٍ هَذَا دِينِي أَدَعُ لَا إِنِّي ، أُمَّ يَا تَفْعَلِي لَا

"মা, আপনি এমন করবেন না! আমি আমার দ্বীন কিছুতেই ত্যাগ করতে পারব না।"

তাঁর কাছে থেকে তাঁর মা দুই দিন না খেয়ে কাটাল। এতে তিনি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েন। তিনি ভেবেছেন, তার এ অবস্থা দেখলে তার মা-ভক্ত ছেলের অন্তরে তার প্রতি দুর্বলতা সৃষ্টি হবে এবং মাকে বাঁচানোর জন্য তিনি দ্বীন ইসলাম বর্জন করবেন। কিন্তু সাদ (রাঃ) এবার আরও পরিষ্কার ভাষায় জানালেন-

إِنْ لِشَيْءٍ هُذَا تَرَكْتُ مَا .نَفْسًا نَفْسًا فَخَرَجَتْ نَفْسٍ مِائَةُ لَكِ كَانَتْ لَوْ ، أُمَّهُ يا وَاللَّهِ تَعْلَمِيْنَ ، أُمَّهُ يَا تَأْكُلِي فَلَا شِئْتِ وَإِنْ فَكُلِي، شِئْتِ

"মা! আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহর শপথ! আপনার যদি একশত প্রাণ থাকত আর সবগুলো একের পর এক বের হয়ে যেত, তবুও আমি আমার দ্বীন ত্যাগ করতাম না। এখন আপনার ইচ্ছে হলে খেতে পারেন আর ইচ্ছে না হলে নাও খেতে পারেন।" (মুসলিম: ১৭৪৮)

হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত (রাঃ) জাহেলি যুগে একজন কর্মকার ছিলেন। তাঁর আস ইবনে ওয়াইলের কাছে তাঁর পাওনা ছিল। আসের কাছে পাওনা চাইতে গেলে সে বলল-'আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদের সঙ্গে কুফরি না করলে আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না।' প্রত্যুত্তরে খাব্বাব (রাঃ) বললেন-

يَبْعَثَكَ ثُمَّ اللَّهُ يُمِيتَكَ حَتَّى ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى بِمُحَمَّدٍ أَكْفُرُ لَا وَاللهِ ، لَا

"আল্লাহর শপথ! তুমি যদি মারা যাও, তারপর পুনরায় জীবিত হও, তবুও আমি মুহাম্মাদ (সাঃ) -এর সঙ্গে কুফরি করব না।" (বুখারি: ২২৬৪)

সাহাবায়ে কেরামগণ ঈমানের এমন স্বাদ পেয়েছিলেন যে ঈমানের জন্য তাঁরা দুনিয়ার সব ভালোবাসাকে আনন্দচিত্তে বিসর্জন দিতে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন। ঈমানের পরিপূর্ণ স্বাদ লাভের যাবতীয় উপকরণ তাঁদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। রাসূল (সাঃ) বলেন, যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে, সে ঈমানের সুমিষ্ট স্বাদ পাবে-

فِي يَعُودَ أَنْ يَكْرَهُ وَأَنْ ، لِلَّهِ إِلَّا يُحِبُّهُ لَا المَرْءَ يُحِبُّ وَأَنْ سِوَاهُمَا، مِمَّا إِلَيْهِ أَحَبَّ وَرَسُولُهُ اللَّهُ يَكُونَ أَنْ .النَّارِ فِي يُقْذَفَ أَنْ يَكْرَهُ كَمَا الكُفْرِ

"১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সব থেকে প্রিয় হওয়া। ২. কাউকে শুধু আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। ৩. কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো ঘৃণ্য মনে করা।" (বুখারি: ১৫)

আপসহীন কুফর মোকাবিলাঃ

আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাথিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে পবিত্র কুরআন ও পূর্বের পাঁচটি কিতাবে মৌলিক দিক তুলে ধরেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

مِّنَ فَضْلًا يَّبْتَغُوْنَ سُجَّدًا رُكَّعًا تَرٰىهُمْ بَيْنَهُمْ رُحَمَآءُ الْكُفَّارِ عَلَي اَشِدَّآءُ مَعَهٗ وَالَّذِيْنَ ۭ اللّٰهِ رَسُوْلُ مُحَمَّدٌ الْاِنْجِيْلِ فِي وَمَثَلُهُمْ ۚۛ التَّوْرٰىةِ فِي مَثَلُهُمْ ذٰلِكَ ۭ السُّجُوْدِ اَثَرِ مِّنْ وُجُوْهِهِمْ فِيْ سِيْمَاهُمْ ۭ وَرِضْوَانًا اللّٰهِ وَعَدَ ۭ الْكُفَّارَ بِهِمُ لِيَغِيْظَ الزُّرَّاعَ يُعْجِبُ سُوْقِهٖ عَلٰي فَاسْتَوٰي فَاسْتَغْلَظَ فَاٰزَرَهٗ شَطْــَٔهٗ اَخْرَجَ كَزَرْعٍ ۚۛ عَظِيْمًا وَّاَجْرًا مَّغْفِرَةً مِنْهُمْ الصّٰلِحٰتِ وَعَمِلُوا اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ اللّٰهُ

“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকূকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার

চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি চারাগাছের মত, যে তার কঁচিপাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কান্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষীকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন।" (সূরা আল-ফাতহ, আয়াতঃ ২৯)

সাহাবায়ে কেরাম সাহসিকতার সাথে কুফরকে মোকাবিলা করেছেন। রক্ত, বংশ, সম্পর্ক আত্মীয়তা কোনোকিছুই তাদেরকে দ্বীন থেকে বিন্দুপরিমান টলাতে পারেনি। হাজার হাজার কাফির সৈন্যপরিবেষ্টিত অবস্থায়ও তাঁরা নিঃশঙ ও নির্ভয় থাকতেন।

ইরানের রাজধানী পারস্যে রুস্তমের দরবারে ১০ সহস্র সৈন্যের খোলা তরবারি মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঝনঝনিয়ে উঠেছিল। ১০ হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র ৭০ জন মুসলিম সৈনিক ছিলেন। এ স্বল্প সংখ্যক সেনাদলের নেতৃত্বে দণ্ডায়মান ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর প্রিয় সাহাবী মুসলিমদের সেনাপতি খালিদ সাইফুল্লাহ (রাঃ)।

সাহাবিগণ হক ও বাতিলের ময়দানে আপন রক্তের ওপর তরবারি চালাতেও এতটুকু দ্বিধা করেননি। বদরের কঠিন দিনে ভাই ভাইয়ের হাতে নিহত হয়েছে। আবু উবায়দা (রাঃ) স্বীয় পিতাকে বদরের যুদ্ধে খোলা তরবারি হাতে নবিজি (সাঃ) এর দিকে অগ্রসর হতে দেখে হত্যা করেন। কুফরির মোকাবিলায় কোনো জড়তাই তাঁদের আচ্ছন্ন করতে পারেনি। কুফরের মোকাবিলায় তাঁরা ইস্পাত কঠিন দৃঢ় ছিলেন।

তাহাজ্জুদগুজারঃ

সাহাবায়ে কেরামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদ আদায় করা। তাঁদের ব্যাপারে বলা হয়েছে- তাঁরা রাতের দরবেশ ও দিনের মুজাহিদ। তাঁরা দিনের বেলায় জিহাদের ময়দানকে রক্ত দিয়ে ও দাওয়াতের জমিনকে ঘাম দিয়ে সিক্ত করেছেন। আবার রাতের বেলা তাঁদের অশ্রুতেই জায়নামাজ সিক্ত হয়ে উঠেছে। আল্লাহ তা'আলা সাহাবীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন-

يُنْفِقُوْنَ رَزَقْنٰهُمْ وَّمِمَّا ۗ وَّطَمَعًا خَوْفًا رَبَّهُمْ يَدْعُوْنَ الْمَضَاجِعِ عَنِ جُنُوْبُهُمْ تَتَجَافٰي

“তাঁদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা হয়। তারা ভয় ও আশা নিয়ে তাঁদের রবকে ডাকে। আর আমি তাদেরকে যে রিষ্ক দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে।”

সাহাবীগণ প্রত্যেক স্বলাতে যেমন নিষ্ঠাবান ছিলেন। তেমনি তাঁরা সকলেই তাহাজ্জুদগুজার ছিলেন। কেননা তারা সকলেই আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে চেয়েছেন। আল্লাত তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন-

وَّقِيَامًا سُجَّدًا لِرَبِّهِمْ يَبِيْتُوْنَ وَالَّذِيْنَ

“আর যারা তাদের রবের জন্য সিজদারত ও দন্ডায়মান হয়ে রাত্রি যাপন করে।”

একে অপরের প্রতি রহমদিলঃ

সাহাবীদের মধ্যে কোনো গোত্রীয় পরিচয় বা বংশীয় মর্যাদা মূখ্য ছিল না, তাঁরা সকেেই একে অপরের প্রতি ছিল সংবেদনশীল। তারা একে অপরজে কেবল আল্লাহর জন্যই ভালোবাসতেন, আর কাউকে ঘৃণা করার প্রয়োজন হলে আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করতেন।

আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবির অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে, মুসলিম ব্যক্তি কাউকে ভালোবাসবে শুধু আল্লাহর জন্য এবং কাউকে ঘৃণাও করবে শুধু আল্লাহর জন্য। রাসূল (সাঃ) বলেন-

الإِيْمَانَ اسْتَكْمَلَ فَقَدِ لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ أَحَبَّ مَنْ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসল, আল্লাহর জন্যই কাউকে ঘৃণা করল; আর আল্লাহর জন্য কাউকে কিছু দিলো এবং আল্লাহর জন্যই কাউকে কিছু দেওয়া থেকে বিরত থাকল, সে ব্যক্তি নিজ ঈমানকে পূর্ণতা দান করল।" আবু দাউদ: ৪৬০৭

সাহাবায়ে কেরাম ঈমানের এই দাবি পূরণে ছিলেন অগ্রগামী। মক্কার নিঃস্ব মুহাজিরদের ভাই হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য রাসূল (সাঃ) আনসারদের নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ বাস্তবায়নে মদিনার আনসারগণ ভ্রাতৃত্বের এক বিরল নজির সৃষ্টি করেন। তাঁরা শুধু ভাই হিসেবে নয় তাঁদের সমস্ত সম্পত্তিতে মুহাজিরদের শরিক করেন।

সাহাবীরা পরস্পরের প্রতি এতটাই দয়ার্দ্র ছিলেন যে তাঁদের অনেকের অর্থকড়ি না থাকলেও তাঁরা সাথিদের মেহমানাারীতে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁদের মেহমানদারির একটি উৎকষ্ট প্রমাণ বুখারির বর্ণনায় এসেছে এভাবে-

এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর নিকট এলেন। তিনি ছিলেন ক্ষুধার্ত। রাসূল (সাঃ) তাঁর স্ত্রীদের নিকট মেহমানের আগমনের খবর পাঠান। তাঁরা জানালেন, 'আমাদের নিকট পান করার জন্য পানি ছাড়া আর কোনো খাবার নেই।' তখন রাসূল (সাঃ) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন- 'তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে লোকটিকে সাথে নিয়ে যাবে এবং মেহমানদারি করবে।' তখন আনসারি সাহাবী আবু তালহা (রাঃ) বললেন-'আমি মেহমানদারি করব, হে আল্লাহর রাসূল।' আবু তালহা লোকটিকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন-'আল্লাহর রাসূলের মেহমানের মেহমানদারির ব্যবস্থা করো।' স্ত্রী বললেন-'আমাদের ঘরে কেবল বাচ্চাদের খাওয়ার পরিমাণ খাবার ছাড়া আর কিছুই নেই।' মেহমানের জন্য কিছু একটা বন্দোবস্ত তো করতেই হবে। আবু তালহার স্ত্রী বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। অতঃপর খাবার পরিবেশন করলেন মেহমানের সামনে। মেহমানের জোরাজুরিতে নিজেরাও খেতে বসলেন। কিন্তু খাবার শুরু করেই তাঁরা কৌশল করে বাতি নিভিয়ে দিলেন। অন্ধকারে তাঁরা দুজনই খাওয়ার অভিনয় করলেন, যাতে মেহমান মনে করেন যে, তাঁরাও খাচ্ছেন। অন্ধকার দস্তরখানে দুজন খাওয়ার ভান করলেন আর মেহমান খাবার খেতে লাগল। আবু তালহা ও তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের ছেলেমেয়েরা সেদিন না খেয়েই রাত যাপন করলেন। আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়ে রাসূল (সাঃ)-কে ওহি নাযিল করে জানিয়ে দিলেন-

اُوْتُوْا مِّمَّاۤ حَاجَةً صُدُوْرِهِمْ فِيْ يَجِدُوْنَ وَلَا اِلَيْهِمْ هَاجَرَ مَنْ يُحِبُّوْنَ قَبْلِهِمْ مِنْ وَالْاِيْمَانَ الدَّارَ تَبَوَّؤُ وَالَّذِيْنَ ۚ الْمُفْلِحُوْنَ هُمُ فَاُولٰٓئِكَ نَفْسِهٖ شُحَّ يُّوْقَ وَمَنْ ۙ۬ خَصَاصَةٌ بِهِمْ كَانَ وَلَوْ اَنْفُسِهِمْ عَلٰٓى وَيُؤْثِرُوْنَ

“আর মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা মদীনাকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং ঈমান এনেছিল (তাদের জন্যও এ সম্পদে অংশ রয়েছে), আর যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে তাদেরকে ভালবাসে। আর মুহাজরিদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে তার জন্য এরা তাদের অন্তরে কোন ঈর্ষা অনুভব করে না। এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদের মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম।” (সূরা আল হাশর, আয়াতঃ ৯)

রাসূল (সাঃ) এর অনুসরণকারীঃ

সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য ছিল রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং একমাত্র তাঁকেই অনুসরণ করা। তাঁরা জীবনের প্রতিটি সময়ে, সকল ক্ষেত্রে একমাত্র রাসূল (সাঃ) কে ইত্তিবা ও অনুসরণ করেছেন। জীবনের আনন্দঘন কিংবা কঠিন মুহূর্ত, দুনিয়াবি চাকচিক্যতা তাঁদেরকে রাসূল (সাঃ) এর অনুসরণ হতে গাফেল করে দেয়নি।

এক প্রশ্নের উত্তরে আলী (রাঃ) বলেন-"রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নিকট আমাদের সন্তান, পিতা-মাতা, ধনসম্পদ, এমনকি তৃষ্ণার্ত বেদুইনের কাছে ঠান্ডা পানি যেমন, তার চাইতেও বেশি প্রিয়।"

নবি (সাঃ)-কে অনুসরণ করা তো আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের একমাত্র উপায়। আল্লাহ বলেন-

رَّحِيْمٌ غَفُوْرٌ وَاللّٰهُ ۗ ذُنُوْبَكُمْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ اللّٰهُ يُحْبِبْكُمُ فَاتَّبِعُوْنِيْ اللّٰهَ تُحِبُّوْنَ كُنْتُمْ اِنْ قُلْ

"(হে নবি) বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।" (সূরা আলি-ইমরান, আয়াতঃ ৩১)

নবিজি (সাঃ) এর নির্দেশ পালনে সাহাবীরা নিষ্ঠাবান ছিলেন। রাসূল (সাঃ) এর সিদ্ধান্তের সামনে তাঁরা নিজেদের জবান, জ্ঞান, আকল, শক্তি, যোগ্যতা, সহায়-সম্পদ, জীবন-মরণ সবকিছুকে অকাতরে ও বিনয়ের সাথে হাজির করেছেন। বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত পরামর্শ সভায় সাদ ইবনে মু'আয (রাঃ) বলেন-

"আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার জীবন! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি আমাদের মহাসাগরে ঝাঁপ দিতে বলেন, আমরা বিনা প্রতিবাদে মরণসমুদ্রে ঝাঁপ দেবো।"

সৃষ্টি থেকে বে-নেয়াজঃ

সাহাবীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তাঁদের প্রয়োজন পূরণে একমাত্র আল্লাহর দারস্থ হতেন। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে হাত পাতেননি। আল্লাহ তা'আলা সাহাবীদের অনুগ্রহ কামনায় একনিষ্ঠতার সত্যায়ন করে বলেন-

اللّٰهَ وَّيَنْصُرُوْنَ وَرِضْوَانًا اللّٰهِ مِّنَ فَضْلًا يَبْتَغُوْنَ وَاَمْوَالِهِمْ دِيَارِهِمْ مِنْ اُخْرِجُوْا الَّذِيْنَ الْمُهٰجِرِيْنَ لِلْفُقَرَاۤءِ
الصّٰدِقُوْنَ هُمُ اُولٰۤئِكَ ۚ وَرَسُوْلَهٗ

"এই সম্পদ নিঃস্ব মুহাজিরগণের জন্য ও যাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পত্তি থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। অথচ এরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেন। এরাই তো সত্যবাদী।" (সূরা আল হাশর, আয়াতঃ ৮)

সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার প্রয়োজনে সমগ্র দুনিয়ার বিরাগভাজন হওয়ার ঝুঁকি নিতে সদা প্রস্তুত ছিলেন। সমস্ত পার্থিব সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টির তুলনায় তাদের কাছে তুচ্ছ ছিল। এমন কোনো সাহাবী পাওয়া যাবে না যিনি বাতিলের অনিকম্পায় দানাপানি গ্রহন করে দুনিয়ার আয়েশি জীবনে বুঁদ হয়ে ছিলেন। তাঁরা লালসার এ পিচ্ছিল চোরাগলি থেকে খুব সন্তর্পণে জান্নাতের পথে হেঁটেছেন।

তাঁদের চেহারায় ছিল বন্দেগীর চিহ্নঃ

সাহাবীদের চেহারায় ছিল বন্দেগির চিহ্ন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

مِّنَ فَضْلًا يَّبْتَغُوْنَ سُجَّدًا رُكَّعًا تَرٰىهُمْ بَيْنَهُمْ رُحَمَآءُ الْكُفَّارِ عَلَي اَشِدَّآءُ مَعَهٗ وَالَّذِيْنَ ۭ اللّٰهِ رَّسُوْلُ مُحَمَّدٌ السُّجُوْدِ اَثَرِ مِّنْ وُجُوْهِهِمْ فِيْ سِيْمَاهُمْ ۭ وَرِضْوَانًا اللّٰهِ

মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকূকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে। (সূরা আল-ফাতহ, আয়াতঃ ২৯)

উক্ত আয়াতে সিজাদার চিহ্ন বলতে কপালে সিজদার কালো দাগ বোঝানো হয়নি, বরং সিজদা ও তাকওয়ার কারণে তাঁদের চেহারায় এক ধরনের উনৃভাসিত জ্যোতিকে বোঝানো হয়েছে। সাহাবীদের প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতেই বোঝা যেত তাঁরা আল্লাহওয়ালা মানুষ।

আয়াতে উল্লেখিত السُّجُوْد اَثَرِ। তথা সিজদার জ্যোতি নুরানি আভা বিশেষ যা কালো মানুষের চেহারায়ও ছড়িয়ে পড়ে। সাহাবীদের মনের পবিত্রতা, আমলের বিশুদ্ধতা, ঈমানের দৃঢ়তা তাঁদের চেহারায় প্রতিফলিত হতো। প্রবাদ আছে- Face Is the Index of minds. 'চেহারা মনের সূচিপত্র।'

কুরআনের স্বজনঃ

সাহাবায়ে কেরামের বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো তাঁরা ছিলেন কুরআনের স্বজন। তাদের জীবনে অধ্যয়নের মূল বিষয় ছিল আল কুরআন। হিদায়াতের আলোক মশালের নাম আল কুরআন। সাহাবীরা দ্বীনের এ নির্ভেজাল উৎস সরাসরি হিদায়াত গ্রহণ করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন-

اَلِيْمٌ رِّجْزٍ مِّنْ عَذَابٌ لَهُمْ رَبِّهِمْ بِاٰيٰتِ كَفَرُوْا وَالَّذِيْنَ ۚ هُدًي هٰذَا

“এই (কুরআন) হিদায়াত দানকারী। আর যারা তাদের রবের আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব।” (সূরা আল-জাসিয়া, আয়াতঃ ১১)

সাহাবীদের বিচরণক্ষেত্র ছিল ‘আল কুরআন’। সাহাবীদের ঈমানের ওপর অবিচল টিকে থাকার জন্য অনুপ্রেরণা আর সাহস জুগিয়েছে কুরআন মাজিদ। মক্কার কাফিররা অবাক নয়নে তাকিয়ে থাকত এই ভেবে যে-কীসের শক্তিতে এত নির্যাতনের পরও শক্ত পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে বিলাল! আর কোন সুরের মূর্ছনায় মুহূর্তে পরিবর্তন হয়ে গেল উমরের শক্ত হৃদয় কপাট! কীসের টানে মুস’আব ইবনে উমাইর তাঁর অঢেল সম্পদ ফেলে দীনতার জীবন বেছে নেন। সে সঞ্জীবনী সুধার নাম তো পবিত্র কুরআন। যা লাওহে মাহফুজ থেকে বান্দার জন্য আল্লাহর খোলা চিঠি। মহান আল্লাহ তা’আলা বলেন-

يَتَوَكَّلُوْنَ رَبِّهِمْ وَّعَلٰي اِيْمَانًا زَادَتْهُمْ اٰيٰتُهٗ عَلَيْهِمْ تُلِيَتْ وَاِذَا قُلُوْبُهُمْ وَجِلَتْ اللّٰهُ ذُكِرَ اِذَا الَّذِيْنَ الْمُؤْمِنُوْنَ اِنَّمَا

“মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে।” (সূরা আল-আনফাল, আয়াতঃ ০২)

হাদিসের আমানতদারঃ

নবী-রাসূলগণ ব্যতীত কোনো মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নন। সাহাবীরা এর ব্যতিক্রম নন। কারণ মানুষের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ভুলে যাওয়া। তবে হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবীগণ ছিলেন খুবই সচেতন ও সর্বোচ্চ আমানতদার। রাসূল (সাঃ) এর হাদিস বর্ণনার বিষয়ে সমস্ত সাহাবী মাহফুজ ছিলেন। তাঁরা ছিলেন হাদিসের সবচেয়ে বড় রক্ষক। কেননা তাঁরা এর ভয়াবহতা সম্পর্কে জানতেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বারংবার বলেছেন-

النَّارِ مِنَ مَقْعَدَهُ فَلْيَتَبَوَّأْ أَقُلْ لَمْ مَا عَلَى يَقُلْ مَنْ

"যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কথা বলবে, যা আমি বলিনি, তাহলে সে জাহান্নামকে নিজের আবাসস্থল বানিয়ে নিলো।" (বুখারি: ১০৯)

আলী (রাঃ) বলেন, নবি (সাঃ) বলেছেন-

النَّارَ فَلْيَلِجِ عَلَى كَذَبَ مَنْ فَإِنَّهُ عَلَى، تَكْذِبُوا لَا

"তোমরা আমার নামে মিথ্যা বলবে না; কারণ, যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে, জাহান্নামে যাবে।" +বুখারি: ১০৭)

হাদিসে রাসূল (সাঃ)-এর আমানত খিয়ানত করা, হাদিসের মধ্যে কোনো নিজস্ব শব্দ সংযুক্ত করা বা কোনো শব্দ ইচ্ছাকৃত বাদ দেওয়া, রাসূল (সাঃ) এর কোনো কথাকে গোপন করা অথবা এমন কোনো কথাকে হাদিসে বলে অভিহিত করা-যা তিনি বলেননি, এই ভয়াবহ অপরাধ থেকে সমস্ত সাহাবী সমগ্র জীবন নিজদের হিফাজত করেছেন। এ বিষয়ে গোটা উম্মতের ইজমা এই যে-'সমস্ত সাহাবী ছিলেন আদিল (হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে পূর্ণ আমানতদার)।'

লক্ষাধিক সাহাবীর মধ্যে সাধারণ একজন সাহাবীও এমন পাওয়া যায়নি, যিনি রাসূল (সাঃ)-এর হাদিসের আমানত খিয়ানত করেছেন অথবা কিছু সংযোজন-বিয়োজন করেছেন।

মুজাহিদে দ্বীন:

সাহাবায়ে কেরামের জীবন অতিবাহিত হয়েছে রাসূল (সাঃ) এর সাহচর্যে ও তাঁর আনীত দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। তাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল দ্বীন। জীবনের কোনোরূপ ব্যস্ততা তাদেরকে এ লক্ষ্য থেকে দূরে সরাতে পারেনি। দ্বীনের জন্য তাঁরা সংসার, আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করেছেন, মরণের ঝুঁকি গ্রহন করেছেন, সন্তানদের এতিম করেছেন। কিন্তু দ্বীনের সামান্যতম ক্ষতি তাঁরা বরদাশত করেননি।

খন্দকের যুদ্ধ চলছে, কনকনে শীতের মধ্যে সাহাবীরা পরিখা খনন করছেন, নবিজি (সাঃ) তাঁদের জন্য দু'আ করছিলেন-

وَالْمُهَاجِرَةُ لِلأَنْصَارِ فَاغْفِرْ الآخِرَهُ عَيْشُ إِلَّا عَيْشَ لَا اللَّهُمَّ

"হে আল্লাহ, আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। আপনি মুহাজির ও আনসারদের মাফ করে দিন।"

নবিজি (সাঃ) এর এ দু'আ শুনে সাহাবীরা আবৃত্তি করে উঠলেন-

أَبَدًا بَقِيْنَا مَا الْجِهَادِ عَلَى + مُحَمَّدًا بَايَعُوا الَّذِيْنَ نَحْنُ

"আমরা তো তারাই, যারা মুহাম্মাদের হাতে বায়াত গ্রহণ করেছি এই মর্মে যে, যতদিন আমরা বেঁচে থাকব, ততদিন জিহাদ করে যাব।" (বুখারি: ৪০৯৮)

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

সাহাবায়ে কেরামগণ হলেন সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মানব এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শের মূর্ত প্রতীক। রাসূল (সাঃ)-এর সান্নিধ্যে, তাঁর সংস্পর্শে সাহাবীগণ পরিণত হন আর্দশমানবে। সাহাবীদের মর্যাদার সমকক্ষ পরবর্তী যুগের কোন মুসলমানই তাঁদের সমমর্যাদা লাভ করতে পারেন নাই, কুরআন-সুন্নাহ এবং বিশ্ব মুসলিমের এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নাই। সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার বিষয়ে পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে ও হাদিসে প্রসংশিত বাণী রয়েছে। নিচে সাহাবায়ে কেরামের কতিপয় মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

তাঁরা সকল কিতাবে আলোচিতঃ

সাহাবায়ে কেরাম সকল নবির উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আম্বিয়ায়ে কেরামের পরেই তাঁদের অবস্থান। সাহাবীদের আগমনের হাজার হাজার বছর পর্বেও আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য আসমানি কিতাবসমূহে তাঁদের চরিত্র ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

مِّنَ فَضْلًا يَّبْتَغُوْنَ سُجَّدًا رُكَّعًا تَرٰىهُمْ بَيْنَهُمْ رُحَمَآءُ الْكُفَّارِ عَلَي اَشِدَّآءُ مَعَهٗ وَالَّذِيْنَ ۭ اللّٰهِ رَّسُوْلُ مُحَمَّدٌ الْاِنْجِيْلِ فِي وَمَثَلُهُمْ ۚۖۛ التَّوْرٰىةِ فِي مَثَلُهُمْ ذٰلِكَ ۚ السُّجُوْدِ اَثَرِ مِّنْ وُجُوْهِهِمْ فِيْ سِيْمَاهُمْ ۭ وَرِضْوَانًا اللّٰهِ وَعَدَ ۭ الْكُفَّارَ بِهِمُ لِيَغِيْظَ الزُّرَّاعَ يُعْجِبُ سُوْقِهٖ عَلٰي فَاسْتَوٰي فَاسْتَغْلَظَ فَاٰزَرَهٗ شَطْـَٔهٗ اَخْرَجَ كَزَرْعٍ ۚۛ عَظِيْمًا وَّاَجْرًا مَّغْفِرَةً مِنْهُمْ الصّٰلِحٰتِ وَعَمِلُوا اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ اللّٰهُ

"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকূকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি চারাগাছের মত, যে তার কঁচিপাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কান্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষীকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন।" (সূরা আল-ফাতহ, আয়াতঃ ২৯)

তাঁরা যেন আকাশের ধ্রুবতারাঃ

লক্ষ্যহারা নিরুদ্দেশের পথে চলমান মানবতার জন্য সাহাবায়ে কেরাম যেন আকাশের ধ্রুবতারা। তাঁদের জীবনকে অনুসরণ করে মানুষ খুঁজে পাবে জান্নাতের পথ, আলোকিত

মুক্তির মনজিল। সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা, পরহেজগারিতা ও দ্বীনের জন্য তাদের ত্যাগ-কুরবানির স্তর এতটাই ওপরে যপ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সাহাবীদের ওপর সন্তুষ্ট হওয়ার সংবাদ কুরআনে ওহি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَرَضُوْا عَنْهُمْ اللهُ رَّضِيَ ۙ بِاِحْسَانٍ اتَّبَعُوْهُمْ وَالَّذِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الْمُهٰجِرِيْنَ مِنَ الْاَوَّلُوْنَ وَالسّٰبِقُوْنَ
الْعَظِيْمُ الْفَوْزُ ذٰلِكَ ؕ اَبَدًا فِيْهَآ خٰلِدِيْنَ الْاَنْهٰرُ تَحْتَهَا تَجْرِيْ جَنّٰتٍ لَهُمْ وَاَعَدَّ عَنْهُ

“আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।” (সূরা আত-তাওবাহ, আয়াতঃ ১০০)

সাহাবীগণ নবিদের মতো মাসুম নন। তবে তারাঁরা গুনাহ করলেও এতটদাি অনুতপ্ত হতেন যে তাওবার ক্রন্দনে তাঁদের গুনাহ শুধু মোচনই হয়নি বরং তা তাঁদের জীবনকে করেছে আরও নির্মল।

সাহাবী মায়েয ইবনে মালিক (রাঃ) নবিজি (সাঃ) এর দরবারে এসে নিজের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে বললেন- 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, ব্যভিচার থেকে আমাকে পবিত্র করুন, আমার ওপর যিনার শাস্তি কার্যকর করুন।' তিনি নিজের যিনার ব্যাপারে বারবার সাক্ষ্য দেওয়ার পর নবিজি (সাঃ) তাঁর ওপর যিনার শাস্তি কার্যকরের সিদ্ধান্ত দেন। তাঁর সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই তাঁর ওপর মৃত্যুর হদ কার্যকর করা হয়। রাসূল (সাঃ) মায়েয ইবনে মালিক (রাঃ) সম্পর্কে বলেন-

لَوَسِعَتْهُمْ أُمَّةٍ بَيْنَ قُسِمَتْ لَوْ تَوْبَةٌ تَابَ لَقَدْ

"মায়েয ইবনে মালিক এমনভাবে তাওবা করেছে, যদি সে তাওবা কোনো অন্যায়কারী জাতির মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়, তবে তা তাদের জন্যও যথেষ্ট হবে।" (মুসলিম: ৪২৮২)

সাহাবীগণ কখনও কোনো ভুল করে ফেললে গাফুরর রাহিম আল্লাহর দরবারে কতটা অনুতপ্ত মনে ফিরে আসতেন, এটি তারই একটি অনন্য উদাহরণ।

তাঁরা উম্মতের জন্য আমানতস্বরূপঃ

সাহাবীদের নিকট থেকেই দ্বীন ইসলামের খবর পেয়েছে উম্মাহ। আর নবি (সাঃ) এর মুখনিসৃত হাদিস তাঁদের থেকেই বর্ণিত হয়েছে। বর্তমানে যতটুকু নির্ভেজাল ইসলামি

অনুশাসন আমরা দেখতে পাই, তা সাহাবায়ে কেরামেরই অবদান। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন-

لِأُمَّتِي أَمَنَةً أَصْحَابِي

"আমার সাহাবীরা উম্মতের জন্য আমানত বা প্রতিরক্ষাস্বরূপ।" (মুসলিম: ৬২৩৬)

রাসূলে পাক (সাঃ) সাহাবীদের নিকট রেখে গেছেন দ্বীনের আমানত। আর সাহাবীদের রেখে গেছেন গোটা উম্মাহর নিকট আমানত।

তাঁরা রাসূল (সাঃ) এর অতি প্রিয়ঃ

সাহাবায়ে কেরামকে যথাযথ সম্মান করা ঈমানের বহিঃপ্রকাশ। তাঁদের বিষয়ে অসুন্দর ও অশালীন কথা বলা থেকে স্বীয় জিহ্বা ও কলম নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। রাসূল (সাঃ) এর ভালোবাসা যে হৃদয়ে রয়েছে, সে হৃদয়ে সাহাবীদের বিষয়ে বিদ্বেষ লালন করা অসম্ভব। তাঁদের ওপর আক্রমণের তির সরাসরি নবিয়ে পাকের কলিজায় বিদ্ধ হয়। আবু সাইদ খুদরি +রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) তাঁর উম্মতকে লক্ষ্য করে বলেছেন-

نَصِيفَه وَلَا أَحَدِهِمْ مُدَّ بَلَغَ مَا ذَهَبًا أُحُدٍ مِثْلَ أَنْفَقَ أَحَدَكُمْ أَنَّ فَلَوْ أَصْحَابِي تَسُبُّوا لَا

"তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ করো না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর, তবে আমার সাহাবীদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ পরিমাণ দানের সওয়াবও তোমাদের অর্জিত হবে না।" (বুখারি: ৩৪০৮)

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) একদিন দেখলেন, এক ব্যক্তি জনৈক পরহেজগার লোকের আমলকে সাহাবীদের আমলের সাথে তুলনা করছেন। তখন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন-

وَإِنْ عُمْرِهِ، جَمِيعَ أَحَدِنَا عَمَلِ مِنْ خَيْرٌ وَاحِدَةً، سَاعَةً وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهِ رَسُولِ مَعَ أَحَدِهِمْ مُقَامُ طَالَ

"রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে একজন সাহাবীর এক মুহূর্তের অবস্থান আমাদের আজীবনের আমলের চেয়েও উত্তম-আমাদের জীবন যতই দীর্ঘ হোক না কেন।" (মানকিবু আবু হানিফা)

ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন-

يَلُوْنَهُمْ الَّذِيْنَ ثُمَّ يَلُوْنَهُمْ الَّذِينَ ثُمَّ قَرْنِي أُمَّتِي خَيْرُ

"আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ। এরপর উত্তম হলো তার পরবর্তী যুগ। এরপর তার পরবর্তী যুগ।" (বুখারি: ৩৩৮৮) [সাহাবায়ে কিরাম আমাদের প্রেরণা, পৃষ্ঠা ১৮-১৯]

সাহাবীদের মর্যাদাগত স্তর

নবি (সাঃ) এর নবুওয়াতি চুম্বকের জাদুময় স্পর্শে লাভে যাদের জীবন ধন্য হয়েছে, তাঁরাই সাহাবী। তাঁদের সকলের অবস্থান এক ও অভিন্ন। তবে তাঁদের নিজেদের মধ্যে মর্যাদাগত তারতাম্য রয়েছে। নিচে এঔ মর্যাদা লগত তারতাম্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

খুলাফায়ে রাশিদুনঃ

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে খুলাফায়ে রাশিদগন মর্যাদাগত দিক থেকে অনন্যতার অধিকারী। খুলাফায়ে রাশিদগণ ইসলামের ৪ জন খলিফা। তাঁরা হলেন-

১. হযরত আবু বকর ইবনে আবি কুহাফা (রাঃ)

২. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)

৩. হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)

৪. হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)

খুলাফায়ে রাশিদুন হলেন সাহাবীদের নেতা ও উম্মাহর পথপ্রদর্শক। তাঁরা রাসূল (সাঃ) এর রেখে যাওয়া আদর্শের আমানতকে আরব ও আজমে বুলন্দ করেছেন, অর্ধ পৃথিবী ব্যাপী আদল ও ইনসাফের ছায়া ছড়িয়ে দিয়েছেন, নবি (সাঃ) এর পর উম্মাতের মুহাম্মাদীর হাল ধরেছেন। নবি-রাসূলদের পরে ইনসানিয়াতের সর্বোচ্চ সৌকর্য বিকশিত হয়েছে খুলাফায়ে রাশিদুনের চরিত্রে ও জীবনে। এজন্যই রাসূল (সাঃ) নিজের সুন্নাতের পাশাপাশি খুলাফায়ে রাশিদুনের রীতিকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। নবি (সাঃ) ইরশাদ করেন-

بِالنَّوَاجِلِ عَلَيْهَا وَعَضُوا بِهَا تَمَسَّكُوا الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِيْنَ الْخُلَفَاءِ وَسُنَّةِ بِسُنَّتِي فَعَلَيْكُمْ

"তোমাদের করণীয় হলো-আমার সুন্নাত এবং সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদুনের রীতিকে আঁকড়ে ধরা। তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে এমনকি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে।" (আবু দাউদ: ৪৬০৭)

রাসূল (সাঃ) তাঁর ইন্তেকালের পরবর্তী ৩০ বছর সময়কালকে 'খিলাফত আলা মিনহাযিন নুবুওয়াত' তথা নবুওয়ত অনুগামী খিলাফত থাকবে বলে ইশারা করে গিয়েছেন। সাঈদ ইবনে জুমহান (রহ.) সাফিনা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন-

ذَلِكَ بَعْدَ مُلْكٌ ثُمَّ سَنَةً ثَلَاثُوْنَ أُمَّتِي فِي الْخِلَافَةُ

"আমার উম্মতের খিলাফতের শাসনকাল হবে ত্রিশ বছর। তারপর হবে বাদশাহি।" (তিরমিযি: ২২২৯)

বর্ণনাকারী সাঈদ ইবনে জুমহান বলেন, হাদিসটি বলার পর সাফিনা (রাঃ) আমাকে বললেন-
فَوَجَدْنَاهَا قَالَ عَلِي خِلَافَةَ أَمْسِكْ لِي قَالَ ثُمَّ . عُثْمَانَ وَخِلَافَةَ عُمَرَ وَخِلَافَةَ بَكْرٍ أَبِي خِلَافَةَ أَمْسِكْ سَنَةً ثَلَاثِينَ

"আবু বকর (রাঃ) এর খিলাফতকাল গণনা করো। এরপর বললেন, উমর ও উসমান (রাঃ) এর খিলাফতকাল গণনা করো। এরপর বললেন, আলী (রাঃ) এর খিলাফতকাল গণনা করো। আমি গুনে দেখলাম যে, এ পর্যন্ত ত্রিশ বছর হয়ে যায়।"

খুলাফায়ে রাশিদুনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন-
تَجِدُوهُ عُمَرَ تُؤَمِرُوا وَإِنْ الْآخِرَةِ، فِي رَاغِبًا الدُّنْيَا، فِي رَاهِدًا أَمِينًا تَجِدُوهُ ، بَكْرٍ أَبَا تُؤَمِرُوا إِنْ مَهْدِيًّا، هَادِيًا تَجِدُوهُ فَاعِلِينَ أَرَاكُمْ وَلَا عَلِيًّا تُؤَمِّرُوا وَإِنْ لَائِمٍ، لَوْمَةَ اللَّهِ فِي يَخَافُ لَا أَمِينًا قَوِيًّا الْمُسْتَقِيمَ الطَّرِيقَ بِكُمُ يَأْخُذُ

“যদি তোমরা আবু বকরকে শাসক নিযুক্ত করো, তবে তাঁকে পাবে আমানতদার; আর সে দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত এবং আখিরাতের প্রতি আসক্ত। আর যদি উমরকে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করো, তবে তাঁকে বিশ্বস্ত ও মজবুত হিসেবে পাবে, আল্লাহর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করবে না। আর যদি তোমরা আলীকে নেতৃত্বের ভার অর্পণ করো, অবশ্য তোমরা তা করবে বলে আমার মনে হয় না। তবে তাঁকে পাবে সঠিক পথে পরিচালক ও পরিচালিত। সে তোমাদের সরল ও সঠিক পথে পরিচালনা করবে।” (মুসনাদে আহমাদ: ৮৫৯)

আশারায়ে মুবাশশরাঃ

‘আশারা’ আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো দশ। আর ‘মুবাশশারা’ অর্থ হলো সুসংবাদপ্রাপ্ত। সুতরাং ‘আশারায়ে মুবাশশারা’ অর্থ সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ ব্যক্তি। আশারায়ে মুবাশশরা বলতে সে দশজন সাহাবীকে বোঝায়, যাঁদের জীবদ্দশায় রাসূল (সাঃ) জান্নাত লাভের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। চলুন ফিরে দেখা যাক মসজিদে নববির সেই মজলিসে, যেখানে দশজন সাহাবীকে রাসূল (সাঃ) জান্নাতি বলে ঘোষনা দিয়েছিলেন-

হিজরি দশম সন। এ সময় মদিনায় এক ভয়াবহ খরা দেখা দেয়। মদিনায় কোনো ফসল সেবার উৎপন্ন হলো না। গাছের সবুজ পাতাগুলো অতি খরায় ছাই রঙ ধারণ করেছে। এ খ্যাদ্যাভাবের সময়ে বহু লোক অনাহারে অভুক্ত অবস্থায় ছিল। কোনো দিক থেকে সহযোগিতা ও খাদ্যসামগ্রী মদিনায় আসার কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছিল না। এমনি একদিন নবি মুহাম্মাদ (সাঃ) মসজিদে নববিতে সাহাবীদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিচ্ছেন। এমন সময় হঠাৎ সংবাদ এলো যে, শামদেশ (বৃহত্তর সিরিয়া) থেকে প্রচুর খাদ্যসামগ্রী নিয়ে একদল ব্যবসায়ী মদিনায় আগমন করছে। খাদ্য ঘাটতির সে সময়টাতে খাদ্যসামগ্রীর খবর শুনে রাসূল (সাঃ) কে রেখে সকলে সেদিকে ছুটল। দলে দলে সকলেই সে ব্যবসায়ী কাফেলার নিকট ভিড় জমাল। কেবল দশজন সাহাবী খুতবারত অবস্থায় থাকা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সামনে বসে রইলেন। ক্ষুধার আহার জোগাড়ে ব্যতিব্যস্ত হলেন না; বরং মনোযোগ সহকারে রাসূল (সাঃ) এর খুতবা শ্রবণে নিমগ্ন রইলেন তাঁরা। রাসূল (সাঃ) তাঁদের একাগ্রতা দেখে খুব খুশি হলেন। ইসলামের ইতিহাসে এই দশজন সাহাবিকেই 'আল আশারাতুল মুবাশশারুনা বিল-জান্নাহ' (بالجنة المبشرون العشرة) 'জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন' বলা হয়। সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেন-

وَعَبْدُ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَلِيٌّ وَعُثْمَانُ الْجَنَّةِ فِي وَعُمَرُ الْجَنَّةِ فِي بَكْرٍ أَبُو الْجَنَّةِ فِي عَشَرَةٌ قَالَ الْقَوْمُ فَقَالَ الْعَاشِرِ عَنِ وَسَكَتَ التَّسْعَةَ هُؤُلَاءِ فَعَدَّ قَالَ .وَقَاصٍ أَبِي بْنُ وَسَعْدُ عُبَيْدَةَ وَأَبُو الرَّحْمَنِ الْجَنَّةِ فِي الأَعْوَرِ أَبُو بِاللهِ نَشَدْتُمُونِي قَالَ الْعَاشِرُ مَنِ الْأَعْوَرِ أَبَا يَا اللَّهَ نَنْشُدُكَ

“রাসূল (সাঃ) বলেন-'দশজন ব্যক্তি জান্নাতি। আবু বকর জান্নাতি, উমর জান্নাতি এবং আলী, উসমান, যুবাইর, তালহা, আবদুর রহমান, আবু উবাইদা ও সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস জান্নাতি।' রাবি বলেন, সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) উক্ত নয়জনকে গুনে গুনে নাম বললেন এবং দশম জন প্রসঙ্গে নীরব থাকেন। সে সময় লোকেরা বলল, 'হে আবুল আওয়ার! আপনাকে আমরা আল্লাহর নামে কসম দিয়ে বলছি, দশম লোক কে?' সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বললেন, 'তোমরা যেহেতু আমাকে আল্লাহর নামে কসম দিয়ে প্রশ্ন করেছ, সেজন্য বলতে হচ্ছে! তাঁদের দশমজন হলেন আবুল আওয়ার।” (তিরমিযি: ৩৭৪৮)

অনেকে মনে করেন, সকল সাহাবীর মধ্যে কেবল মাত্র ১০ জন সাহাবীই জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছেন। এরূপ ধারণা যথার্থ নয়। উপর্যুক্ত দশজন সাহাবী ছাড়াও অনেক সাহাবী নবি (সাঃ) এর নিকট থেকে জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছেন। নবি (সাঃ) এর ভাষ্যমতে, নবিদৌহিত্র হাসান-হুসাইন (রাঃ) জান্নাতে যুবকদের নেতা হবেন এবং তাঁদের মা নবিকন্যা ফাতিমা (রাঃ) জান্নাতের নারীদের নেত্রী হবেন। ইসলামের জন্য লড়াকুপ্রাণ, হাবশি গোলাম,

ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন বিলাল (রাঃ) কেও নবিজি (সাঃ) মহানিয়ামতপূর্ণ জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। একদা রাসূল (সাঃ) বিলাল (রাঃ) সম্পর্কে বলেন-

الْجَنَّةِ فِي يَدَيَّ بَيْنَ نَعْلَيْكَ خَشْفَ اللَّيْلَةَ سَمِعْتُ فَإِنِّي

"আজ রাতে আমি জান্নাতে তোমার জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি।" (মুসলিম: ২৪৫৮)

নবিজি (সাঃ) এর চাচা জাফর ইবনে আবু তালিবের জান্নাতের পাখির মতো উড়ে বেড়ানোর সুসংবাদ নবিজি (সা:) এভাবে দিচ্ছেন-

الْمَلَائِكَةِ مَعَ الْجَنَّةِ فِي يَطِيرُ جَعْفَرًا رَأَيْتُ

"আমি স্বপ্নে জাফরকে জান্নাতের মধ্যে ফেরেশতাদের সাথে উড়ে বেড়াতে দেখেছি।" (তিরমিযি: ৩৭৬৩)

আবার খাদিজা (রাঃ) যখন হেরা গুহায় রাসূল (সাঃ) এর জন্য খাবার বহন করে নিয়ে যেতেন, তখন একদিন জিবরিল (আঃ) রাসূল (সাঃ) এর কাছে এসে বললেন-

فَاقْرَأْ أَتَتْكَ هِيَ فَإِذَا ، شَرَابٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ إِدَامٌ فِيْهِ إِنَاءٌ مَعَهَا أَتَتْ قَدْ خَدِيجَةُ هُذِهِ اللهِ رَسُولَ يَا نَصَبَ وَلَا فِيْهِ، صَخَبَ لَا ، قَصَبٍ مِنْ الجَنَّةِ فِي بِبَيْتٍ وَبَشِّرْهَا وَمِنِي، رَبِّهَا مِنْ السَّلَامَ عَلَيْهَا

"হে আল্লাহর রাসূল, ওই যে খাদিজা একটি পাত্রে তরকারি অথবা খাবার বা পানি নিয়ে আপনার কাছে আসছেন। যখন তিনি আপনার কাছে আসবেন, আপনি তাঁকে তাঁর রবের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম বলবেন। আর তাঁকে জান্নাতে একটি মুক্তাখচিত প্রাসাদের সুসংবাদ দেবেন, যেখানে কোনো শোরগোল নেই, আর নেই কোনো কষ্ট ও ক্লান্তি।" (বুখারি: ৩৮২০)

আহলে বাইতঃ

'আহলে বাইত' শব্দের অর্থ হলো ঘরের বাসিন্দা। ইসলামি পরিভাষায় নবি (সাঃ) এর পরিবারবর্গকে আহলে বাইত বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা আহলে বাইতকে বিশেষ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اللهَ وَاَطِعْنَ الزَّكٰوةَ وَاٰتِيْنَ الصَّلٰوةَ وَاَقِمْنَ الْاُوْلٰى الْجَاهِلِيَّةِ تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ وَلَا بُيُوْتِكُنَّ فِيْ وَقَرْنَ تَطْهِيْرًا وَيُطَهِّرَكُمْ الْبَيْتِ اَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِيُذْهِبَ اللهُ يُرِيْدُ اِنَّمَا ۗ وَرَسُوْلَهٗ

"আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের

আনুগত্য কর। হে নবী পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।" (সূরা আল-আহযাব, আয়াতঃ ৩৩)

আহলে বাইতের মর্যাদাকে বিশেষায়িত করতে তাঁদের জন্য সদাকা ও মানত গ্রহণ হারাম করে দেওয়া হয়েছে। আহলে বাইতের প্রধাণতম সদস্য হলেন- হযরত আলী (রাঃ), হযরত ফাতিমা (রাঃ), হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসাইন (রাঃ)। এক সকালে রাসূল (সাঃ) এ চারজনকে আহলে বাইত বলে সম্বোধন করেন। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত-

عَلِي بْنُ الْحَسَنُ فَجَاءَ أَسْوَهَ شَعْرٍ مِنْ مُرَخَّلٌ مِرْطٌ وَعَلَيْهِ غَدَاةٌ وسلم عليه الله صلى النَّبِيُّ خَرَجَ إِنَّمَا : قَالَ ثُمَّ فَأَدْخَلَهُ عَلِيٌّ جَاءَ ثُمَّ فَأَدْخَلَهَا فَاطِمَةُ جَاءَتْ ثُمَّ مَعَهُ فَدَخَلَ الْحُسَيْنُ جَاءَ ثُمَّ فَأَدْخَلَهُ تَطْهِيرًا وَيُطَهِّرَكُمْ الْبَيْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ

"নবি (সাঃ) একদিন সকালবেলা (ঘরের সন্নিকটে) বের হলেন। তাঁর গায়ে ছিল একটি কালো পশমি চাদর। তখন হাসান ইবনে আলী তাঁর কাছে এলেন। রাসূল (সাঃ) তাঁকে চাঁদরের ভেতর ঢুকিয়ে নিলেন। এরপর হুসাইন এলেন। রাসূল (সাঃ) তাঁকেও হাসানের সঙ্গে চাদরে ঢুকিয়ে নিলেন। এরপর ফাতিমা এলেন এবং রাসূল (সাঃ) তাঁকেও চাদরের ভেতর জড়িয়ে নিলেন। অতঃপর আলী এলেন। রাসূল সা. তাঁকেও চাদরের ভেতরে ঢুকিয়ে নিলেন। (চারজনকেই একই সাথে চাদরাবৃত করা অবস্থায়) রাসূল (সাঃ) (সূরা আহযাবের ৩৩তম আয়াতটি) তিলাওয়াত করলেন-হে আহলে বাইত, আল্লাহ তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে চান। আর চান তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।" (মুসলিম: ৬০৪৩)

হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ) কে অত্যাধিক ভালোবাসতেন, তাঁদের সাথে খেলা করতেন। হাসান রা.-এর জন্য নানা মুহাম্মাদ সা, বিশেষ দুআ করেছেন। হাসান (রা) কে ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মোনাজাত করেন-

يُحِبُّهُ مَن وَأَحْبِبْ فَأَحِبَّهُ أُحِبُّهُ إِنِّي اللهُمَّ

"হে আল্লাহ, আমি একে ভালোবসি। আপনিও তাঁকে ভালোবাসুন। যে তাঁকে ভালোবাসে, আপনি তাঁকেও ভালোবাসুন।" (মুসলিম: ৬০৩৮)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর স্ত্রীগণও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মাজিদে তাঁদেরকে 'উম্মতের মা' তথা বিশ্বাসীদের মা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নবি (সাঃ) এর ইন্তেকালের পরও সাহাবীগণ উম্মুল মুমিনিনদের খোঁজখবর নিতেন। আবদুর রহমান ইবনে

(রাঃ) উম্মুল মুমিনিনদের জন্য সে সময় চার লাখ চল্লিশ হাজার দিরহামের সম্পত্তি ওয়াকফ করেছিলেন।

প্রথম যুগের মুহাজির ও আনসারগণঃ

ইসলাম গ্রহণের পর সাহাবীদের ওপর মক্কার মুশরিকরা অকথ্য নির্যাতন চালাতে থাকে। কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেলে, নবুওয়াতের ৫ম হিজরিতে নবি (সাঃ) সাহাবীদের আবিসিনিয়ায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশ পাওয়ার পর ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলাসহ মোট ১৫ জন মুহাজির আবিসিনিয়ায় (বর্তমানে ইথিওপিয়া) হিজরত করেন। এসকল সাহাবীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) , জাফর ইবনে আবু তালিব (রাঃ), আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ), মুস'আব ইবনে উমাইর (রাঃ), উসমান ইবনে মাযউন (রাঃ) প্রমুখ।

আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশি মুহাজির মুসলিমদের সাহায্য করেন, কুরাইশদের কর্তৃক পাঠানো চিঠিতে মুহাজির মুসলিমদের তাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানালেও নাজ্জাশি তা নাকোচ করেন ও মুসলিমদের নিরাপত্তার ঘোষণা দেন। এরপর তিনি নিজেও ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (সাঃ) তাঁর মৃত্যুতে গায়েবানা জানাজা আদায় করেন।

মদিনার কিছু লোক নবুওয়াতের ১১তম ও ১২ তম বছর হজ্জ মৌসুমে ইসলাম গ্রহণ করেন। মদিনায় দাওয়াতি কাজ ও নওমুসলিমদের তারবিয়াতের জন্য মুস'আব ইবনে উমাইর (রাঃ) কে পাঠানো হয়। পরবর্তী বছর হজ্জের মুস'আব ইবনে উমাইর ৭৫ জন মুসলিমের বিরাট বহরসহ আকাবা নামক স্থানে রাসূল (সাঃ) এর সাথে সমবেত হন ও মদিনাবাসী মুসলিমরা রাসূল (সাঃ) ও মক্কায় নিপীড়িত মুসলিমদের মদিনায় আমন্ত্রণ জানান। মদিনাবাসীর আন্তরিক আমন্ত্রণ ও আল্লাহর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করেন। হিজরতকারী এ সকল সাহাবি হলেন 'মুহাজির'। মদিনার মুসলিমদের আন্তরিক সাহায্যের কারণে তাঁদের বলা হতো 'আনসার'। আনসার শব্দের অর্থ সাহায্যকারী।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের এ মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের প্রশংসা করে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

وَرَضُوْا عَنْهُمْ اللّٰهُ رَّضِيَ ۙ بِاِحْسَانٍ اتَّبَعُوْهُمْ وَالَّذِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الْمُهٰجِرِيْنَ مِنَ الْاَوَّلُوْنَ وَالسّٰبِقُوْنَ
الْعَظِيْمُ الْفَوْزُ ذٰلِكَ ؕ اَبَدًا فِيْهَآ خٰلِدِيْنَ الْاَنْهٰرُ تَحْتَهَا تَجْرِيْ جَنّٰتٍ لَهُمْ وَاَعَدَّ عَنْهُ

“আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।” (সূরা আত-তাওবাহ, আয়াতঃ ১০০)

ইসলাম গ্রহনের কারণে সাহাবীদের প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যাওয়া ও মদিনার আনসারগণ কর্তৃক মুহাজিরদের ভাই হিসেবে সাদরে গ্রহণ, এ ত্যাগের কারণে রাসূল (সাঃ) মুহাজির ও আনসারদের ভালোবাসতেন ও তাঁদের জন্য আল্লাহর কাছে কায়মনাবাক্যে দু'আ করতেন।

খন্দক যুদ্ধের সময় সাহাবায়ে কেরাম মাটি কাটছিলেন। তাঁদের সাথে মাড়ি কাটার কাজ করছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)। সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, সেদিন যখন আমরা পরিখা খননের জন্য মাটি কাটছিলাম এবং কাঁধে করে মাটি বহন করছিলাম, তখন রাসূল (সাঃ) বলছিলেন-

وَالْأَنْصَارِ لِلْمُهَاجِرِينَ فَاغْفِرْ الْآخِرَهْ عَيْشُ إِلَّا عَيْشَ لَا اللَّهُمَّ

“হে আল্লাহ, প্রকৃত জীবন একমাত্র আখিরাতের জীবন। মুহাজির ও আনসারদের আপনি ক্ষমা করে দিন।” (বুখারি: ৩৫২৫)

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) বলেন-

الأَنْصَارِ بُغْضُ النِّفَاقِ وَآيَةُ الأَنْصَارِ، حُبُّ الإِيْمَانِ آيَةُ

“আনসারদের প্রতি ভালোবাসা ঈমানেরই নিদর্শন। আর তাঁদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা মুনাফিকির পরিচায়ক।” (বুখারি: ৩৫১৩)

আহলে আকাবাঃ

‘আকাবা’ হলো মক্কা থেকে দশ মাইল দূরে হেরা পাহাড় ও মিনার মধ্যবর্তী উপত্যকা। নবুওয়াতের ১১ তম বছরে মদিনার ১২ জন সদস্যের একটি সত্যান্বেষী ক্ষুদ্র দল আকাবার উপত্যকায় উপস্থিত হন ও রাসূল (সাঃ) এর নিকটে ইসলামের শপথ গ্রহণ করেন। এ দলটি ছিল মদিনার বনু খাযরাজ ও বনু আউসের লোক। এ শপথে অংশগ্রহণকারী সাহাবী আসাদ ইবনে যুরারা (রাঃ) ও মদিনায় প্রেরিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতিনিধি মুস'আব ইবনে উমাইর (রাঃ) এর আন্তরিক প্রচেষ্টায় মদিনার মানুষ ইসলামের ছায়াতলে শামিল হন।

পরের বছর হজ্জ মৌসুমে ৭৫ জন মদিনাবাসী আকাবার পূর্বনির্ধারিত স্থানে সমবেত হন ও শপথ গ্রহন করেন। তাঁদের মধ্যে ২ জন নারীও ছিলেন। তাঁরা পাঁচটি বিষয়ে চপথ গ্রহণ করেন। তা হলো- শিরক, ব্যভিচার, চুরি, সন্তান হত্যা ও মিথ্যা অপবাদ থেকে বেঁচে থাকা। অতঃপর তাঁরা রাসূল (সাঃ) কে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা সকলে সম্মিলিতভাবে রাসূল (সাঃ) এর হাতে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করেন। তাঁরা রাসূল (সাঃ) কে নেতা হিসেবে বরণ করে নেন ও তাঁকে মদিনায় আমন্ত্রণ জানান। ইতিহাসে এই ঘটনাকে 'আকাবার শপথ' নামে অভিহিত করা হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) আকাবার শপথের সময় বলেছিলেন-'হে আল্লাহর রাসূল, আমরা আপনার জন্য স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, সহায়-সম্পদ সমস্ত কিছু কুরবানি দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি।' এই প্রতিশ্রুতিতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আশ্বস্ত হন। মদিনাকে ইসলামি রাষ্ট্রের বুনিয়াদ হিসেবে প্রস্তুত করার ব্যাপারে এ শপথ গ্রহণকারী আনসারদের ভূমিকা অগ্রগামী।

আহলে বদরঃ

বদরের যুদ্ধ ইসলামের প্রথম সামরিক যুদ্ধ। বদর যুদ্ধ ২য় হিজরির ১৭ রমজান সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে আবু জাহেলের নেতৃত্বে ১ হাজার কাফির সৈন্যের বিরুদ্ধে নবি (সাঃ) এর সেনাপতিত্বে মাত্র ৩১৩ জন সাহাবী সামান্য পাথেয় নিয়ে লড়াই করেন। আল্লাহর সাহায্য ও রহমতে বিজয়ী হন। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৮৩ জন মুহাজির ও বাকিরা আনসার সাহাবী ছিলেন। এ যুদ্ধে ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু আবু জাহল নিহত হয়। বদরের প্রান্তরে ৭০ জন কাফির নিহত হয় ও ১৪ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, বদরের দিন নবিজি (সাঃ) সিজদারত অবস্থায় দু'আ করছিলেন-

اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ اللَّهُمَّ وَعْدَكَ عَهْدَكَ أَنْشُدُكَ إِنِّي

"হে আল্লাহ, আমি আপনার প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ, আপনি যদি চান (কাফিররা জয়লাভ করুক), তাহলে আপনার ইবাদত করার মতো আর কেউ থাকবে না!"

আবেগঘন এ দু'আ শুনে আবু বকর (রাঃ) আর স্থির থাকতে পারলেন না! তিনি নবিজি (সাঃ) এর হাত ধরে বললেন-'হে আল্লাহর রাসূল, যথেষ্ট হয়েছে।' তখন রাসূল (সাঃ) সূরা ক্বমারের ৪৫-৪৬ আয়াত দুটি পড়তে পড়তে সেনাশিবিরে তাঁর জন্য নির্মিত কুটি থেকে বের হলেন-

.اَمَرُّ وَ أَدْهٰى وَالسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ السَّاعَةُ بَلِ .الدُّبُرَ وَيُوَلُّوْنَ الْجَمْعُ سَيُهْزَمُ

"শীঘ্রই দুশমনরা পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। মূলত কিয়ামতই হবে তাদের শাস্তির নির্ধারিতকাল। আর কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর।" (বুখারি: ২৭১৪)

আল্লাহ তায়ালা নবিজি (সাঃ) এর দু'আ কবুল করলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে বদরের ময়দানে আসমানি ফেরেশতাগণ লড়াইয়ে অংশ নিয়েছেন। বদরের প্রান্তরে আল্লাহ তা'আলার অবধারিত সাহায্যের কথা কুরআনে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

تَشْكُرُوْنَ لَعَلَّكُمْ اللهَ فَاتَّقُوا ۚ اَذِلَّةٌ وَّاَنْتُمْ بِبَدْرٍ اللهُ نَصَرَكُمُ وَلَقَدْ

"আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছেন অথচ তোমরা ছিলে হীনবল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায়, তোমরা শোকরগুজার হবে।" (সূরা আলি-ইমরান, আায়াতঃ ১২৩)

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের আল্লাহ তা'আলা ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছেন, অন্যান্য সাহাবীগণ বদরি সাহাবীদের অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং রাসূল (সাঃ) তাদের বিশেষ মর্যাদা দিতেন ও ভালোবাসতেন। মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে বদরি সাহাবী হাতিব ইবনে আবি বালতা (রাঃ) এর ঘটনাটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাসূল (সাঃ) মক্কা বিজয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন খুবই সন্তর্পণে যেন রক্তপাত এড়ানো যায়। কিন্তু হাতিব ইবনে আবি বালতা (রাঃ) এ গোপন সংবাদ মক্কাবাসীকে জানাতে একটি চিঠি লেখেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, মক্কায় আটকে পড়া তাঁর অসহায় পরিবার-পরিজনদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু তাঁর এই তৎপরতা ছিল শৃঙ্খলার লঙ্ঘন। আল্লাহ তা'আলা ওহি মারফত এই চিঠির খবর রাসূল (সাঃ) কে জানিয়ে দেন। ফলে হাতিব (রাঃ) এর চিঠিটি বাহক সমেত ধরা পড়ে। হাতিব (রাঃ) স্বীয় অপরাধ স্বীকার করে নেন। সাহাবীদের কেউ কেউ বিশেষ করে উমর (রাঃ) হাতিব (রাঃ) কে কঠোর শাস্তি দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু রাসূল (সাঃ) তাঁকে এ বলে ক্ষমা করে দেন যে, হাতিব (রাঃ) বদরি সাহাবী ছিলেন, আর আল্লাহ তা'আলা আহলে বদরকে মাফ করে দিয়েছেন। এরপর নবি (সাঃ) বললেন-

الْجَنَّةُ لَكُمْ وَجَبَتْ فَقَدْ.

“তোমাদের (বদরি সাহাবিদের) জন্য জান্নাত অবধারিত।”

এ কথা শুনে উমর (রাঃ) কেঁদে উঠে বললেন-
‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জানেন।’ (বুখারি: ৩৬৯৪)

একদিন বদর যুদ্ধে শহিদ সাহাবী হারিসা ইবনে সুরাকা (রাঃ) এর মা নবিজি (সাঃ) এর দরবারে এসে জানতে চাইলেন-তাঁর ছেলে হারিসা যে বদরে শহিদ হয়েছে, তাঁর কী অবস্থা? সে জান্নাত পেয়েছে কি না? নবি (সাঃ) তাঁর মায়ের জবাবে বলেন-

الفردوس جَنَّة في وإنَّهُ

“সে তো জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ করেছে।” (বুখারিঃ ৩৯৮১)

বদরে শহিদ সাহাবীদের সম্পর্কে লোকেরা যখন বলাবলি করছিল, আহা! অমুকের মৃত্যু হয়েছে, সে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন তাদের মন্তব্যের জবাবে আল্লাহ তা’আলা বলেন-

تَشْعُرُوْنَ لَّا وَّلٰكِنْ اَحْيَآءٌ بَلْ ؕ اَمْوَاتٌ اللّٰهِ سَبِيْلِ فِيْ يُّقْتَلُ لِمَنْ تَقُوْلُوْا وَلَا

“যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না।” (সূরা আল-বাকারহ, আয়াতঃ ১৫৪)

মুজাহিদে দ্বীনঃ

যে সকল সাহাবী রাসূল (সাঃ)এর সাথে দ্বীন প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, তাঁরা সকলেই অনন্য মর্যাদার অধিকারী। প্রথম দিকের যুদ্ধগুলোতে অংশগ্রহণকারীরা পরবর্তী সময়ের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আবার যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাননি তাদের থেকে যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন সেসকল সাহাবিগণ বেশি মর্যাদাবান।

আল্লাহর নিকট জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা সকলের ওপরে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

ؕ وَاَنْفُسِهِمْ بِاَمْوَالِهِمْ اللّٰهِ سَبِيْلِ فِيْ وَالْمُجٰهِدُوْنَ الضَّرَرِ اُولِي غَيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْقٰعِدُوْنَ يَسْتَوِي لَا اللّٰهُ وَفَضَّلَ ؕ الْحُسْنٰي اللّٰهُ وَّعَدَ وَكُلًّا ؕ دَرَجَةً الْقٰعِدِيْنَ عَلَي وَاَنْفُسِهِمْ بِاَمْوَالِهِمْ الْمُجٰهِدِيْنَ اللّٰهُ فَضَّلَ عَظِيْمًا اَجْرًا الْقٰعِدِيْنَ عَلَي الْمُجٰهِدِيْنَ

“বসে থাকা মুমিনগণ, যারা ওযরগ্রস্ত নয় এবং নিজদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীগণ এক সমান নয়। নিজদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদকারীদের মর্যাদা আল্লাহ বসে থাকাদের উপর অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ প্রত্যেককেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আল্লাহ জিহাদকারীদেরকে বসে থাকাদের উপর মহা পুরস্কার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।”

সাহাবীদের মর্যাদা

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ, কারণ তারা ছিলেন ইসলামের নিকটতম সহযোগী এবং সত্যের রক্ষক। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) তাঁদেরকে ন্যায়পরায়ণ ও সত্যের মাপকাঠি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাঁদের অনুসরণ করাকে সঠিক পথ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অনেক সাহাবীকে জীবিত অবস্থায় জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল। ১০ জন সাহাবী জীবিত থাকতেই জান্নাত লাভের সুংবাদ পেয়েছিলেন। তারা হলেন-

ইসলামের চার খলিফাঃ

- হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)
- হযরত উমর ফারুক (রাঃ)
- হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)
- হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ)

অন্য ৬ জন সাহাবী হলেনঃ

- হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ)
- হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রাঃ)
- হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)
- হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ)
- হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)
- হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ)

নিচে আশারায়ে মুবাশশরা অর্থাৎ জান্নাতের সুংবাদপ্রাপ্ত দশ জন সাহাবীদের মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)
ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠায় চির আপসহীন

আবু বকর (রাঃ) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা ও বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহনকারী। তিনি ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর প্রধান সাহাবী। সৎ ব্যবসায়ী হিসেবেও তিনি খ্যাতমান ছিলেন। আবু বকর (রাঃ) এর সাথে নবী (সাঃ) এর খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। নবিজি (সাঃ) এর ইসরা ও মিরাজের সংবার শোনামাত্রই আবু বকর (রাঃ) বিশ্বাস করে

নিয়েছিলেন। এ অগাধ বিশ্বাসের কারণে রাসূল (সাঃ) তাঁকে 'আস-সিদ্দিক' তথা পরম বিশ্বাসী উপাধি প্রদান করেন। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন,

نَبِيٌّ عَلَيْكَ فَإِنَّمَا أُحُدُ، اثْبُتْ :فَقَالَ بِهِمْ، فَرَجَفَ وَعُثْمَانُ، وَعُمَرُ بَكْرٍ وَأَبُو أُحُدًا، صَعِدَ ﷺ النَّبِيَّ أَنَّ وَشَهِيدَانِ وَصِدِّيقٌ،

"নবি (সাঃ) উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করলেন। তাঁর সঙ্গে আরও আরোহণ করলেন আবু বকর, উমর ও উসমান। তাঁদের সবাইকে নিয়ে উহুদ কেঁপে উঠল (ভূমিকম্প হলো)। তখন তিনি বললেন, উহুদ, তুমি স্থির হয়ে যাও। কারণ, তোমার ওপর রয়েছেন একজন নবি, একজন সিদ্দিক এবং দুজন শহিদ।" (সহিহ বুখারি: ৩৬৭৫)

আবু বকর (রাঃ) ছিলেন রাসূল (রাঃ) এর সবচেয়ে প্রিয় পুরুষ। আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেন-

عُمَرُ ثُمَّ :قَالَ مَنْ؟ ثُمَّ :قُلْتُ أَبُوهَا :فَقَالَ الرِّجَالِ؟ مَنِ فقلت عَائِشَةُ :قَالَ إِلَيْكَ؟ أَحَبُّ النَّاسِ أَيُّ :قُلْتُ رِجَالًا فَعَدَّ الْخَطَّابِ بْنُ

"আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন মানুষ আপনার কাছে সর্বাধিক ভালোবাসার পাত্র? রাসুল বলেন, আয়েশা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, পুরুষদের মধ্যে? তিনি বললেন, তাঁর পিতা (আবু বকর রাঃ)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কে? তিনি বললেন, উমর ইবনুল খাত্তাব। এরপর তিনি ক্রমানুসারে আরও কয়েকজন ব্যক্তির কথা বললেন।" (সহিহ বুখারি: ৩৬৬২, ৪৩৫৮)

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন; রাসুল (সাঃ) বলেন-

مُتَّخِذًا كُنْتُ وَلَوْ قُحَافَةَ، أَبِي بْنِ بَكْرِ أَبِي مِنْ وَمَالِهِ نَفْسِهِ فِي عَلَيَّ أَمَنَّ أَحَدٌ النَّاسِ مِنَ لَيْسَ إِنَّهُ أَفْضَلُ الْإِسْلَامِ خُلَّةُ وَلَكِنْ خَلِيلًا، بَكْرٍ أَبَا تَخَذْتُ لَا خَلِيلًا، النَّاسِ مِنَ

"জান-মাল দ্বারা আবু বকর ইবনু আবি কুহাফার চেয়ে আমার প্রতি কেউ অধিক অনুগ্রহ করেনি। আমি মানুষের মধ্য থেকে কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে অবশ্যই আবু বকরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। তবে ইসলামের সম্প্রীতিই উত্তম।" (সহিহ বুখারি: ৪৬৭)

এছাড়া স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে আবু বকর (রাঃ) কে আস-সাহিব বলে উল্লেখ করেছেন। আস-সাহিব অর্থ সঙ্গী। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন-

لِصَاحِبِهِ يَقُوْلُ اِذْ الْغَارِ فِي هُمَا اِذْ اثْنَيْنِ ثَانِيَ كَفَرُوْا الَّذِيْنَ اَخْرَجَهُ اِذْ اللهُ نَصَرَهُ فَقَدْ تَنْصُرُوْهُ اِلَّا كَفَرُوا الَّذِيْنَ كَلِمَةَ وَجَعَلَ تَرَوْهَا لَّمْ بِجُنُوْدٍ وَاَيَّدَهُ عَلَيْهِ سَكِيْنَتَهُ اللهُ فَاَنْزَلَ ۚ مَعَنَا اللهَ اِنَّ تَحْزَنْ لَا حَكِيْمٌ عَزِيْزٌ وَاللهُ ۗ الْعُلْيَا هِيَ اللهِ وَكَلِمَةُ ۗ السُّفْلٰي

“যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছেন যখন কাফিররা তাকে বের করে দিল, সে ছিল দু’জনের দ্বিতীয়জন। যখন তারা উভয়ে পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান করছিল, সে তার সঙ্গীকে বলল, ‘তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন’। অতঃপর আল্লাহ তার উপর তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে এমন এক সৈন্য বাহিনী দ্বারা সাহায্য করলেন যাদেরকে তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফিরদের বাণী অতি নিচু করে দিলেন। আর আল্লাহর বাণীই সুউচ্চ। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।” (সূরা আত-তাওবাহ, আয়াতঃ ৪০)

আবু বকর (রাঃ) যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন এ নিয়ে সাহাবীদের মধ্যেও দ্বিধা-সংকোচ ছিল না। আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) বলেন,

لَا ﷺ النَّبِيِّ أَصْحَابَ نَتْرُكُ ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ أَحَدًا، بَكْرٍ بِأَبِي نَعْدِلُ لَا ﷺ النَّبِيِّ زَمَنِ فِي كُنَّا بَيْنَهُمْ نُفَاضِلُ

“আমরা নবি (সাঃ) এর জামানায় আবু বকর (রাঃ) এর সমতুল্য কাউকে গণ্য করতাম না, তারপর উমর (রাঃ) তারপর উসমান (রাঃ)। এরপর আমরা নবি-এর বাকি সাহাবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের জন্য তুলনা করতাম না।” (সহিহ বুখারি: ৩৬৯৭)

হয়রত আবু বকর (রাঃ) এর শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই রাসুল (সাঃ) এর জীবনের অন্তিম সময়ে তাঁকেই নামাজের ইমাম নির্ধারণ করেছিলেন, যা দ্বারা রাসুলের ওফাতের পর তিনিই যে হবেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত ইমামুল মুসলিমিন, এরই গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। আয়েশা (রাঃ) বলেন,

يُصَلِّيَ أَنْ بَكْرٍ أَبَا مُرُوا فَقَالَ بِالصَّلاَةِ يُوذِنُهُ بِلاَلٌ جَاءَ وسلم عليه الله صلى اللهِ رَسُولُ ثَقُلَ لَمَّا مَقَامَكَ يَقُمْ مَا مَتَى وَإِنَّهُ أَسِيفٌ رَجُلٌ بَكْرٍ أَبَا إِنَّ وسلم عليه الله صلى اللهِ رَسُولَ يَا فَقُلْتُ بِالنَّاسِ أَبَا إِنَّ لَهُ قُولِي لِحَفْصَةَ فَقُلْتُ بِالنَّاسِ يُصَلِّي بَكْرٍ أَبَا مُرُوا فَقَالَ عُمَرَ أَمَرْتَ فَلَوْ النَّاسَ يُسْمِعُ لاَ صَوَاحِبُ لَأَنْتُنَّ إِنَّكُنَّ قَالَ عُمَرَ أَمَرْتَ فَلَوْ النَّاسَ يُسْمِعُ لاَ مَقَامَكَ يَقُمْ مَتَى وَإِنَّهُ أَسِيفٌ رَجُلٌ بَكْرٍ وسلم عليه الله صلى اللهِ رَسُولُ وَجَدَ الصَّلاَةِ فِي دَخَلَ فَلَمَّا بِالنَّاسِ يُصَلِّيَ أَنْ بَكْرٍ أَبَا مُرُوا يُوسُفَ سَمِعَ فَلَمَّا الْمَسْجِدَ دَخَلَ حَتَّى الْأَرْضِ فِي يَخُطَّانِ وَرِجْلاَهُ رَجُلَيْنِ بَيْنَ يُهَادَى فَقَامَ خِفَّةً نَفْسِهِ فِي اللهِ رَسُولُ فَجَاءَ وسلم عليه الله صلى اللهِ رَسُولُ إِلَيْهِ فَأَوْمَأَ يَتَأَخَّرُ بَكْرٍ أَبُو ذَهَبَ حِسَّهُ بَكْرٍ أَبُو اللهِ رَسُولُ وَكَانَ قَائِمًا يُصَلِّي بَكْرٍ أَبُو فَكَانَ بَكْرٍ أَبِي يَسَارِ عَنْ جَلَسَ حَتَّى وسلم عليه الله صلى أَبِي بِصَلاَةِ مُقْتَدُونَ وَالنَّاسُ اللهِ رَسُولِ بِصَلاَةِ بَكْرٍ أَبُو يَقْتَدِي قَاعِدًا يُصَلِّي وسلم عليه الله صلى عَنْهُ اللهُ رَضِيَ بَكْرٍ.

“আল্লাহর রাসুল যখন (রোগে) পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন, একদা বিলাল এসে নামাজের কথা বললেন। নবি বললেন, আবু বকরকে বলো, লোকদের নামাজের ইমামতি করতে। আমি (আয়েশা) বললাম, আল্লাহর রাসুল, (আমার বাবা) আবু বকর অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের ব্যক্তি। তিনি যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন (কান্নার আতিশয্যে) সাহাবিদেরকে কিছুই শোনাতে পারবেন না। যদি আপনি উমরকে এ নির্দেশ দেন (তবে ভালো হবে)। রাসুল আবার বললেন, আবু বকরকে বলো, লোকদের নামাজের ইমামতি করতে। তখন আমি হাফসাকে বললাম, তুমি তাঁকে একটু বলো, আবু বকর অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের ব্যক্তি। তিনি যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন (কান্নার আতিশয্যে) সাহাবিদেরকে কিছুই শোনাতে পারবেন না। যদি আপনি উমরকে এ নির্দেশ দেন (তবে ভালো হবে)। এ কথা শুনে আল্লাহর রাসুল বললেন, তোমরা ইউসুফের সাথি নারীদের মতো। আবু বকরকে বলো, লোকদের নামাজের ইমামতি করতে। আবু বকর লোকদের নিয়ে নামাজ শুরু করলেন। তখন আল্লাহর রাসুল নিজে একটু সুস্থবোধ করলেন এবং দুজন সাহাবির কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মসজিদে গেলেন। তাঁর দু-পা মাটির ওপর দিয়ে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। আবু বকর যখন তাঁর আগমন টের পেলেন, পেছনে সরে যেতে উদ্যত হলেন। আল্লাহর রাসুল তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করলেন (নিজ স্থানে থাকার জন্য)। তারপর তিনি এসে আবু বকরের বামপাশে বসে গেলেন। অবশেষে আবু বকর দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করছিলেন আর আল্লাহর রাসুল বসে নামাজ আদায় করছিলেন। আবু বকর আল্লাহর রাসুলের নামাজের অনুসরণ (ইকতিদা) করছিলেন আর সাহাবিরা আবু বকরের নামাজের অনুসরণ (ইকতিদা) করছিল। (সহিহ বুখারি: ৩৬৯৭)

আবু বকর (রাঃ) অত্যন্ত কোমল ও সহৃদয়বান ছিলেন। তবে ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সীমাহীন মজবুত। যেদিন রাসূল (সাঃ) ইন্তেকাল করেন সেদিন সকল সাহাবায়ে কেরাম শোকে বিহ্বল ও দিশেহারা হয়ে পড়েন। উমর (রাঃ) তরবারি হাতে নিয়ে ঘোষণা দেন, ‘যে বলবে মুহাম্মদ (সাঃ) ইন্তেকাল করেছেন, তাকে হত্যা করা হবে। এ সময় আবু বকর (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এর লাশ মুবারকে চুমু কুরআনের আয়াত পড়লেন-

تَخْتَصِمُوْنَ رَبِّكُمْ عِنْدَ الْقِيٰمَةِ يَوْمَ اِنَّكُمْ ثُمَّ .مَّيِّتُوْنَ وَّاِنَّهُمْ مَيِّتٌ اِنَّكَ

“নিশ্চয় তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল। তারপর কিয়ামতের দিন নিশ্চয় তোমরা তোমাদের রবের সামনে ঝগড়া করবে।” (সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩০-৩১)

রাসূল (সাঃ) এর বিচ্ছেদে আবু বকর (রাঃ) এর হৃদয় সবচেয়ে বেশি ব্যথিত ছিল। সমস্ত বেদনা বুকে চেপে রেখে মসজিদে নববির মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন-

يُّرِدْ وَمَنْ ۚ مِنْهَا نُؤْتِهِ الدُّنْيَا ثَوَابَ يُّرِدْ وَمَنْ ۗ مُّؤَجَّلًا كِتٰبًا اللّٰهِ بِاِذْنِ اِلَّا تَمُوْتَ اَنْ لِنَفْسٍ كَانَ وَمَا
الشّٰكِرِيْنَ وَسَنَجْزِي ۗ مِنْهَا نُؤْتِهِ الْاٰخِرَةِ ثَوَابَ

"আর কোন প্রাণী আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মারা যায় না, তা নির্দিষ্টভাবে লিখিত আছে। আর যে দুনিয়ার প্রতিদান চায়, আমি তা থেকে তাকে দিয়ে দেই, আর যে আখিরাতের বিনিময় চায়, আমি তা থেকে তাকেও দেই এবং আমি অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেব।" (সূরা আলি 'ইমরান, আয়াতঃ ১৪৫)

আবু বকর (রাঃ) এর এ বক্তব্যের পর শোকার্ত সাহাবীদের অস্থিরতা প্রশমিত হল। অগ্নিশর্মা উমর (রাঃ) এর তরবারি হাত থেকে খসে পড়ল। আবু বকর (রাঃ) এর হাত চুম্বন করে উমর (রাঃ) বললেন- 'কুরআনের এ আয়াত আমার স্মৃতি থেকে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছে আপনার ওপর আল্লাহর সিদ্ধান্ত অবতীর্ণ হয়েছে।'

নবি (সাঃ) এর ওয়াফাতের পর আবু বকর (রাঃ) এর দূরদর্শিতা ও তাকওয়ার কারণে তাঁকে ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। খলিফা হওয়ার পর তিনি যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন।

খুলাফায়ে রাশিদুনের মধ্যেও আবু বকর(রাঃ) ও উমর (রাঃ) এর মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। হুজায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেন; রাসুল (সাঃ) বলেন-

وَعُمَرَ بَكْرٍ، أَبِي إِلَى وَأَشَارَ .بَعْدِي مِنْ بِاللَّذَيْنِ فَاقْتَدُوا فِيكُمْ، بَقَائِي مَا أَدْرِي لَا إِنِّي

"আমি জানি না তোমাদের মধ্যে আর কতদিন বাঁচব। সুতরাং তোমরা আমার পরে যে দুজন রয়েছেন, তাঁদের অনুসরণ করো। এ কথা বলে তিনি আবু বকর ও উমর রা. -এর দিকে ইশারা করলেন।" (সুনানুত তিরমিযী: ৩৬৬৩, ৩৬৬২, ৩৭৯৯; সুনানু ইবনি মাজাহ: ৯৭; মুসনাদু আহমাদ: ২৩২৪৫, ২৩৩৮৬, ২৩৪১৯; সহিহ ইবনু হিব্বান: ৩২৩৫)

তবে তাঁদের দুজনের মধ্যেও আবু বকর (রাঃ) এর মর্যাদা তুলনামূলক বেশি। আমিরুল মুমিনিন উমর (রাঃ) বলেন-

بِهِمْ لَرَجَحَ الْأَرْضِ أَهْلِ بِإِيمَانِ بَكْرٍ أَبِي إِيمَانُ وَزِنْ لَوْ

“যদি আবু বকরের ইমানকে সমগ্র পৃথিবীবাসীর ইমানের সঙ্গে মাপা হয়, তাহলে তাঁর ইমান সবার ইমানের ওপর প্রাধান্য পাবে।” (শুআবুল ইমান: ৩৬; কানজুল উম্মাল: ৩৫৬১৪)

হযরত উমর ফারুক (রাঃ)
আল্লাহর ভয়ে এক প্রকম্পিত হৃদয়

আবু বকর (রাঃ) এরপরে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আমিরুল মুমিনিন সায়্যিদুনা হযরত উমর ফারুক (রাঃ)। তিনি ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। যার নামেই সর্বপ্রথম ‘আমিরুল মুমিনিন’ সম্ভাষণ বাক্য উচ্চারিত হয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাঃ)-এর নিকট তাঁর স্থান অতি উচ্চে। এজন্য বলা হয়েছে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর সব মতের সমর্থনেই সর্বদা কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন-

عُثْمَانُ ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ بَكْرٍ، أَبُو نَبِيِّهَا بَعْدَ الْأُمَّةِ هَذِهِ خَيْرُ

“নবী (সাঃ)-এর পর উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ), তারপর হযরত ওমর (রাঃ), তারপর হযরত উসমান (রাঃ)।” (ইবনে শাহীন, শারহু মাযাহিবি আহলিস সুন্নাহ, পৃ. ৩১৪, হাদীসঃ ১৯৫)

হযরত উমর (রাঃ) ছিলেন মুহাদ্দাস। মুহাদ্দাস হলেন এমন ব্যক্তি যার ধারণা সত্য হয়, যার মুখ থেকে সত্য বের হয় ও যার অন্তরে ফেরেশতাদের উচ্চ পরিষদের পক্ষ থেকে ইলহাম ঢেলে দেওয়া হয়। আবু আবু বকর রা.-এর পরে এই উম্মাহর মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি হলেন হরায়রা রা. বর্ণনা করেন; রাসুল বলেন,

بْنُ عُمَرُ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ هَذِهِ أُمَّتِي فِي كَانَ إِنْ وإِنَّهُ مُحَدَّثُونَ الأمَمِ مِنَ قَبْلَكُمْ مَضَى فِيمَا كَانَ قَدْ إِنَّهُ الْخَطَّابِ

“তোমাদের আগের উম্মতসমূহের মধ্যে মুহাদ্দাস ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। আমার উম্মতের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে, তবে সে নিশ্চয় উমর ইবনুল খাত্তাব হবেন।” (সহিহ বুখারি: ৩৪৬৯, ৩৬৮৯)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন; রাসূল (সাঃ) বলেছেন-

وَقَالَ فِيهِ فَقَالُوا قَطُّ أَمْرٌ بِالنَّاسِ نَزَلَ مَا عُمَرَ ابْنُ وَقَالَ .وَقَلْبِهِ عُمَرَ لِسَانِ عَلَى الْحَقَّ جَعَلَ اللَّهَ إِنَّ قَالَ . عُمَرُ قَالَ مَا نَحْوِ عَلَى الْقُرْآنُ فِيهِ نَزَلَ إِلاَّ خَارِجَةُ شَكَّ فِيهِ الْخَطَّابِ ابْنُ قَالَ أَوْ عُمَرُ فِيهِ الْفَضْلَ عَنِ الْبَابِ وَفِي عِيسَى أَبُو

“আল্লাহ তাআলা উমরের মুখে ও হৃদয়ে সত্যকে স্থাপন করেছেন। ইবনু উমর (রাঃ) বলেন, জনগণের সম্মুখে কখনো কোনো প্রসঙ্গ আবির্ভূত হলে লোকজনও তা সম্পর্কে মন্তব্য ব্যক্ত করত এবং উমর ইবনুল খাত্তাবও অভিমত ব্যক্ত করতেন। দেখা যেত, উমরের অভিমতের সমর্থনে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।” (সুনানুত তিরমিযীঃ ৩৬৮২)

ইসলাম গ্রহণের পর উমর (রাঃ) এর তাকওয়া ও দ্বীনের প্রতি অবিচলতা দেখে রাসূল (সাঃ) বলেন-

الْخَطَّابِ بْنَ عُمَرَ لَكَانَ نَبِيٌّ بَعْدِي كَانَ لَوْ

“আমার পরে কেউ যদি নবি হতো, তবে অবশ্যই উমর ইবনুল খাত্তাবই নবি হতো।” (সুনানুত তিরমিজি: ৩৬৮৬)

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উমর (রাঃ) ছিল ইসলামের ঘোর শত্রু। উমর (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণ ছিল ইসলামের প্রাথমিক বিজয়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন-

صَلَّى حَتَّى قُرَيْشًا، قَاتَلَ عُمَرُ أَسْلَمَ فَلَمَّا عُمَرُ أَسْلَمَ حَتَّى الْكَعْبَةِ عِنْدَ نُصَلِّيَ أَنْ عَلَى نَقْدِرُ كُنَّا مَا مَعَهُ وَصَلَّيْنَا الْكَعْبَةِ عِنْدَ

উমর ইসলাম গ্রহণের আগপর্যন্ত আমরা কাবাগৃহে নামাজ আদায়ে সক্ষম হইনি। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশদের সাথে লড়াই করেন ও কাবায় নামাজ আদায় করেন। আর আমরাও তাঁর সাথে নামাজ আদায় করি। ইবনু হিশাম ১/৩৪২

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) আরও বলেন

عُمَرُ أَسْلَمَ مُنْذُ أَعِزَّةً زِلْنَا مَا .

যেদিন উমর ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন থেকে আমরা মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করেছি। বুখারি: ৩৪১৯

খলিফা আবু বকর (রাঃ) খিলাফতের দ্বিতীয় বর্ষে অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় থাকতেই তিনি খিলাফতের পরবর্তী প্রতিনিধি নির্ধারণ করতে চাচ্ছিলেন। তাই তিনি সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেন এবং জনতাকে সমবেত করে বক্তব্য দেন। সে বক্তব্যে আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বলেন-

"হে লোকসকল, আমি আমার বংশ থেকে কাউকে খিলাফতের এ দায়িত্ব দিচ্ছি না। আমি এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষের ওপর খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি।"

উমর যখন শুনলেন পরবর্তী খলিফা তিনি হতে যাচ্ছেন, তখন তিনি বললেন-
'আমি খাত্তাবের পুত্র উমর, আমি পাহাড়ে মেষ চরিয়ে বেড়িয়েছি, কী করে আমি খলিফা হই!'
খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি উমর জানিয়ে দিয়েছেন- 'আমি খিলাফত চাই না।'

আবু বকর (রাঃ) বলেন- 'হে উমর, তুমি খিলাফত চাও না, কিন্তু খিলাফত তোমাকে চায়।'

উমর (রাঃ) এর আল্লাহ ভীতি প্রকট ছিল। আল্লাহর ভয়ে তিনি এতটাই কান্না করতেন যে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত এমনি তিনি মাঝে মাঝে হুশ হারিয়ে ফেলতেন। অতিরিক্ত কান্নার কারণে তার গন্ডদেশে দুটি কালো দাগ পড়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে তিনি তৃণখণ্ড হাতে নিয়ে একাকী কাঁদতেন আর বলতেন-

"আহা উমরের মা! উমরকে কেন জন্ম দিয়েছিলে? আমি যদি মানুষ না হয়ে একটি তৃণ হতাম, কতো ভাল হতো! তবে আমাকে আল্লাহ তায়ালার কাছে জবাব দিতে হতো না।"
(সাহাবায়ে কিরাম আমাদের প্রেরণা, পৃষ্ঠাঃ ৬৩)

উমর (রাঃ) ছিলেন এতটাই সুদৃঢ় ইমানের অধিকারী, শয়তানও তাঁকে দেখলে ভয়ে দূরে সরে যেত। সা'আদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বর্ণনা করেন; রাসুল (সাঃ) বলেন-
فَجَكَ غَيْرَ فَبًّا سَلَكَ إِلَّا قَطُّ فَيًّا سَالِكًا الشَّيْطَانُ لَقِيَكَ مَا بِيَدِهِ، نَفْسِي وَالَّذِي الْخَطَّابِ، ابْنَ يَا إِيهَا

"হ্যাঁ, ঠিকই হে ইবনুল খাত্তাব! যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম, শয়তান যখনই কোনো রাস্তায় তোমাকে দেখতে পায়, সে তখনই তোমার ভয়ে সেই রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরে।" (সহিহ বুখারি: ৩৬৮৩)

রাসুল (সাঃ) আবু বকর ও উমর (রাঃ) কে কত বেশি ভালোবাসতেন, তা নিচের হাদিসটি থেকে সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন-

إِلَّا يَرُعْنِي فَلَمْ فِيهِمْ، وَأَنَا يُرْفَعَ، أَنْ قَبْلَ وَيُصَلُّونَ يَدْعُونَ النَّاسُ فَتَكَنَّفَهُ سَرِيرِهِ، عَلَى عُمَرُ وُضِعَ بِمِثْلِ اللهِ أَلقى أَنْ إِلَيَّ أَحَبَّ أَحَدًا خَلَّفْتُ مَا :وَقَالَ عُمَرَ عَلَى فَتَرَحَمَ عَلَى، فَإِذَا مَنْكِبِي، آخِذُ رَجُلٌ أَسْمَعُ كَثِيرًا كُنْتُ أَنّى وَحَسِبْتُ صَاحِبَيْكَ، مَعَ اللهُ يَجْعَلَكَ أنى لأظن كنت إن اللهِ، وَايْمُ مِنْكَ، عَمَلِهِ بَكْرٍ وَأَبُو أَنَا وَخَرَجْتُ وَعُمَرُ، بَكْرٍ وأبو أنا وَدَخَلْتُ وَعُمَرُ، بَكْرٍ وَأَبُو أَنا ذَهَبْتُ :يَقُولُ ﷺ النَّبِيَّ وَعُمَرُ

“উমরের লাশ খাটের ওপর রাখা হলো। খাটটি কাঁধে তুলে নেওয়ার আগ পর্যন্ত লোকজন তা ঘিরে দু’আ পাঠ করছিল। আমিও তাদের মধ্যে একজন ছিলাম। হঠাৎ একজন আমার কাঁধে হাত রাখায় আমি চমকে উঠলাম। চেয়ে দেখলাম, তিনি আলি। তিনি উমরের জন্য আল্লাহর অশেষ রহমতের দু’আ করছিলেন। তিনি বলছিলেন, হে উমর, আমার জন্য আপনার চেয়ে বেশি প্রিয় কোনো ব্যক্তি আপনি রেখে যাননি, যাঁর আমলের অনুসরণ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করব। আল্লাহর কসম, আমার এ বিশ্বাস, আল্লাহ আপনাকে আপনার সঙ্গীদ্বয়ের সঙ্গে রাখবেন। আমার মনে আছে, আমি অনেকবার নবি-কে বলতে শুনেছি, আমি, আবু বকর ও উমর গেলাম। আমি, আবু বকর ও উমর প্রবেশ করলাম এবং আমি, আবু বকর ও উমর বের হলাম ইত্যাদি।” (সহিহ বুখারি: ৩৬৮৫)

তিনি ছিলেন আল্লাহর দীনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন; রাসুল (সাঃ) বলেন-

وَأَعْلَمُهُمْ عَفَّانَ، بْنُ عُثْمَانُ حَيَاءً وَأَصْدَقُهُمْ عُمَرُ، اللَّهِ أَمْرِ فِي وَأَشَدُّهُمْ بَكْرٍ، أَبُو بِأُمَّتِي أُمَّتِي أَرْحَمُ أَمِينٌ أُمَّةٍ وَلِكُلِّ كَعْبٍ، بْنُ أُبَيُّ وَأَقْرَؤُهُمْ ثَابِتٍ، بْنُ زَيْدُ وَأَفْرَضُهُمْ جَبَلٍ، بْنُ مُعَاذُ وَالْحَرَامِ بِالْحَلَالِ الْجَرَّاحِ بْنُ عُبَيْدَةَ أَبُو الْأُمَّةِ هَذِهِ وَأَمِينُ

“আমার উম্মতের মধ্যে আবু বকর আমার উম্মতের প্রতি সবচেয়ে বেশি দয়ালু। আল্লাহর বিধান প্রয়োগে উমর তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক কঠোর। তাঁদের মধ্যে উসমান ইবনু আফফান সবচেয়ে বেশি লাজুক। তাঁদের মধ্যে হালাল ও হারাম প্রসঙ্গে মু’আয ইবনে জাবাল সবচেয়ে বেশি ওয়াকিফহাল। তাঁদের মধ্যে ফারায়িজ (উত্তরাধিকার-সম্পর্কিত বিধান) সম্বন্ধে যায়েদ ইবনু সাবিত সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ। তাঁদের মধ্যে অধিক উত্তমরূপে কুরআন মাজিদ পাঠকারী উবাই ইবনু কা’আব। আর প্রত্যেক উম্মতের একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক থাকে। এ উম্মতের সর্বাধিক বিশ্বস্ত লোক আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ।” (সুনানুত তিরমিযী: ৩৭৯০, ৩৭৯১)

আবু সায়িদ খুদরি (রা:) বর্ণনা করেন; রাসুল (সাঃ) বলেন-

دُونَ يَبْلُغُ مَا وَمِنْهَا القَدْيَ، يَبْلُغُ مَا فَمِنْهَا قُمُصُ، وَعَلَيْهِمْ عَلَيَّ عُرِضُوا النَّاسَ رَأَيْتُ نَائِمُ، أَنَا بَيْنَا الدِّينَ :قَالَ اللَّهِ؟ رَسُولَ يَا أَوَّلْتَهُ فَمَا :قَالُوا اجْتَرَهُ قَمِيصُ وَعَلَيْهِ عُمَرُ عَلَيَّ وَعُرِضَ ذَلِكَ،

“একবার আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। দেখতে পেলাম, অনেক লোককে আমার সামনে উপস্থিত করা হলো। তাদের গায়ে জামা ছিল। কারও কারও জামা এত ছোট ছিল যে, কোনোভাবে বুক পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর কারও জামা এর থেকেও ছোট ছিল। আর উমরকেও আমার সামনে পেশ করা হলো। তাঁর শরীরে এত লম্বা জামা ছিল যে, সে জামাটি হেঁচড়িয়ে চলছিল। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আল্লাহর রাসুল, আপনি এ স্বপ্নের কী তাবির (ব্যাখ্যা) করলেন তিনি বললেন, দ্বীনদারি।” (সহিহ বুখারিঃ ৩৬৯১)

উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)
ধৈর্য ও উদারতার মূর্তপ্রতীক

হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) ছিলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা। প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি একজন। তিনি ছিলেন ‘যুননুরাইন’ বা দুই নূরের অধিকারী। নবি (সাঃ) প্রথমে তাঁর কন্যা রুকাইয়া (রাঃ) এর সাথে উসমান (রাঃ) এর বিয়ে দেন। রুকাইয়া (রাঃ) হিজরি ২য় সনে বদর যুদ্ধের পর পর মারা গেলে নবি (সাঃ) তার দ্বিতীয় কন্যা উম্মে কুলসুমের সাথে উসমান (রাঃ) কে বিয়ে দেন। তিনি হাবশা ও মদিনায় উভয় জায়গাতেই হিজরত করেছিলেন।

হযরত উসমান (রাঃ) নামকরা ব্যবসায়ী ছিলেন। তার ধনাঢ্যতাও প্রসিদ্ধ ছিল। এ কারণে তাঁর নাজের শেষে ‘গনি’ কুনিয়াত যুক্ত হয়। গনি অর্থ ধনশালী।

উসমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকটতম ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর বিশেষ স্থান ছিল। রাসূল (সাঃ) বার বার তাঁকে জান্নাতের খোশখবর দিয়েছেন। হযরত তালহা ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত; নবি (সাঃ) বলেছেন-

عُثْمَانُ - الْجَنَّةِ فِي يَعْنِي - وَرَفِيقِي رَفِيقٌ نَبِيٌّ لِكُلِّ

‘প্রত্যেক নবীরই বন্ধু থাকে, জান্নাতে আমার বন্ধু হবে উসমান।’ (আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর আস-সুনান, খ. ৫, পৃ. ৬২৪, হাদিস: ৩৬৯৮)

نَتْرُكُ ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ أَحَدًا، بَكْرٍ بِأَيْ تَعْدِلُ لَا ﷺ النَّبِيِّ زَمَنِ فِي كُنَّا :قَالَ ، عُمَرَ ابْنِ عَنِ بَيْنَهُمْ نُفَاضِلُ لَا ، النَّبِيِّ أَصْحَابَ

“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবি (সাঃ) এর সময়ে মুসলমানরা হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত উসমান (রাঃ) কে সকলের থেকে অধিক মর্যাদাবান মনে করতেন। তা ছাড়া অন্য কোনো সাহাবীকে বিশেষ কোনো মর্যাদা দেওয়া হতো না।” ((সহিহ-বুখারী, আস-সহীহ, ৫, পৃ. ১৪, হাদিস: ৩৬৯৭)

হযরত উসমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সময়ে কাতিবে অহী (অহী লেখক) ছিলেন। সিদ্দীকী ও ফারুকী যুগে ছিলেন পরামর্শদাতা। প্রতিবছরই তিনি হজ আদায় করতেন। তবে যে বছর শহীদ হন, ঘেরাও থাকার কারণে হজ আদায় করতে পারেননি। সারা বছরই রোযা রাখতেন। সারারাত ইবাদতে কাটতো। এক রাকআতে একবার কুরআন শরীফ খতম করতেন। রাতে কারও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতেন না। রাতে চাকরদের খেদমত গ্রহণ করতেন না। উসমান (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত লাজুক স্বভাবের। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলিলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন-

عَفَّانَ بْنُ عُثْمَانُ حَيَاءٌ وَأَصْدَقُهُمْ

'আমার উম্মতের মধ্যে উসমান সর্বাধিক লজ্জাশীল।” (আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর আস-সুনান, খ. ৫, পৃ. ৬৬৪, হাদিস: ৩৬৯০)

হয়রত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) আরও বলেছেন-

الْمَلَائِكَةُ مِنْهُ تَسْتَحِي رَجُلٍ مِنْ أَسْتَحِي أَلَا

আমি কি এমন ব্যক্তির ব্যাপারে লজ্জাবোধ করব না, যার ব্যাপারে ফেরেশতারাও লজ্জাবোধ করেন! (সহিহ বুখারি: ৩৬৯১)

উসমান (রাঃ) কে নবি (সাঃ) এত ভালোবাসতেন যে, তিনি তাঁর হাতকে উসমানের হাত আখ্যায়িত করেন। হুদায়বিয়াতে অনুষ্ঠিত বাইয়াতের আগে রাসূল (সাঃ) উসমান (রাঃ) কে কুরাইশদের সাথে মধ্যস্থতা করার জন্য মক্কায় পাঠান। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তখনই ইতিহাস বিখ্যাত 'বাইয়াতুর রিদওয়ান' অনুষ্ঠিত হয়। তখন সাহাবায়ে কিরাম রাসূল (সাঃ)

এর হাতে হাত রেখে বাইয়াতবদ্ধ হন। সে সময় নবি (সাঃ) অনুপস্থিত উসমানের বাইয়াতও নিজের প্রতিনিধিত্বে গ্রহণ করেন। রাসূল (সাঃ) আপন ডান হাতের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন-

لِعُثْمَانَ هُذِهِ : وَقَالَ يَدِهِ عَلَى بِهَا فَضَرَبَ عُثْمَانَ يَدُ هُذِهِ

"এটা উসমানের হাত। তারপর তিনি সে হাতটি নিজের অপর হাতের ওপর রেখে বললেন- এটা উসমান-এর বাইয়াত।" (বুখারি: ৩৪৩৩)

ইসলামের জন্য উসমান (রাঃ) বিপুল সম্পদ অকাতরে ব্যয় করতেন। মদিনায় সুপেয় পানির অভাব দেখা দিলে তিনি রুমা নামক কূপ খনন করে ওয়াকফ করে দেন। নবম হিজরিতে তাবুক যুদ্ধে ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের মধ্যে দশ হাজার সৈন্যের অশ্ব, রসদ ও যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব তিনি একাই বহন করেন। আহনাফ ইবনু কায়েস (রাঃ) বর্ণনা করেন-

آتٍ، أَتَانَا إِذْ رِحَالَنَا نَضَعُ مَنَازِلِنَا فِي نَحْنُ فَبَيْنَا الْحَجَّ، نُرِيدُ وَنَحْنُ الْمَدِينَةَ فَقَدِمْنَا حُجَّاجًا، خَرَجْنَا وَسَطِ فِي نَفَرٍ عَلَى مُجْتَمِعُونَ النَّاسُ فَإِذَا فَانْطَلَقْنَا وَفَزِعُوا، الْمَسْجِدِ فِي اجْتَمَعُوا قَدِ النَّاسَ إِنَّ :فَقَالَ رضي عُثْمَانُ جَاءَ إِذْ لَكَذَلِكَ فَإِنَّا وَقَاصٍ، أَبِي بْنُ وَسَعْدُ وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، عَلِيَّ، وَفِيهِمْ الْمَسْجِدِ سَعْدٌ؟ هُنَا أَهَا الزُّبَيْرُ؟ هُنَا أَهَا طَلْحَةُ؟ هُنَا أَهَا :فَقَالَ رَأْسَهُ بِهَا قَنَّعَ قَدْ صَفْرَاءُ مُلَاءَةٌ عَلَيْهِ عنه الله يَبْتَاعُ مَنْ :قَالَ ﷺ اللهِ رَسُولَ أَنَّ أَتَعْلَمُونَ هُوَ، إِلَّا إِلَهَ لَا الَّذِي بِاللَّهِ أَنْشُدُكُمْ فَإِنِّي :قَالَ نَعَمْ، : قَالُوا ﷺ اللهِ رَسُولَ فَأَتَيْتُ أَلْفًا، وَعِشْرِينَ بِخَمْسَةٍ أَوْ أَلْفًا بِعِشْرِينَ فَابْتَعْتُهُ ۚ لَهُ اللَّهُ غَفَرَ فُلَانٍ بَنِي مِرْبَدَ هُوَ، إِلَّا إِلَهَ لَا الَّذِي بِاللَّهِ أَنْشُدُكُمْ :قَالَ .نَعَمْ اللَّهُمَّ :قَالُوا لَكَ وَأَجْرُهُ مَسْجِدِنَا فِي اجْعَلْهُ :فَقَالَ فَأَخْبَرْتُهُ رَسُولَ فَأَتَيْتُ وَكَذَا، بِكَذَا فَابْتَعْتُهَا لَهُ؟ اللَّهُ غَفَرَ رُومَةَ بِئْرَ ابْتَاعَ مَنِ :قَالَ ﷺ اللهِ رَسُولَ أَنَّ أَتَعْلَمُونَ :قَالَ .نَعَمْ اللَّهُمَّ : قَالُوا لَكَ، وَأَجْرُهَا لِلْمُسْلِمِينَ سِقَايَةً اجْعَلْهَا :قَالَ وَكَذَا بِكَذَا ابْتَعْتُهَا قَدِ :فَقُلْتُ ﷺ اللَّهِ يُجَهِّزُ مَنْ :فَقَالَ الْقَوْمِ وُجُوهِ فِي نَظَرَ ﷺ اللهِ رَسُولَ أَنَّ أَتَعْلَمُونَ هُوَ، إِلَّا إِلَهَ لَا الَّذِي بِاللَّهِ أَنْشُدُكُمْ اللَّهُمَّ : فَقَالُوا خِطَامًا، وَلَا عِقَالًا يَفْقِدُوا لَمْ حَتَّى فَجَهَّزْتُهُمْ الْعُسْرَةِ، جَيْشَ يَعْنِي ، لَهُ اللَّهُ غَفَرَ هَؤُلَاءِ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ :قَالَ .نَعَمْ

"আমরা হজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে মদিনায় উপনীত হলাম। হজে গমনের জন্য আমরা আমাদের মনজিলে পৌঁছে হাওদা নামাচ্ছিলাম, এমন সময় আমাদের কাছে এক আগন্তুকের আবির্ভাব হলো। সে বলল, লোকেরা মসজিদে একত্রিত হয়েছে। তারা ভীত হয়ে পড়েছে। আমরা সেখানে গিয়ে দেখলাম, মসজিদের মধ্যস্থলে একদল লোকের চতুর্দিকে কিছু মানুষ একত্রিত হয়ে আছে। তাদের মধ্যে আলি, জুবায়ের, তালহা এবং সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) রয়েছেন। আমরা এ অবস্থায় ছিলাম, এমন সময় উসমান (রাঃ) এলেন। তাঁর পরনে ছিল হলুদ বর্ণের একখানা কাপড়, তা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা ঢেকে রেখেছেন। তিনি বললেন,

এখানে কি তালহা আছেন? এখানে কি জুবায়ের আছেন? এখানে কি সা'দ আছেন? সকলে বলল, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, আমি ওই আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা করছি, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, তোমরা কি অবগত আছ যে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, অমুক গোত্রের উট বাঁধার বা খেজুর শোকানোর স্থানটি যে ক্রয় করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন। এরপর আমি তা ২০ হাজার অথবা ২৫ হাজায় মুদ্রায় খরিদ করেছি। আমি রাসুল (সাঃ) এর খিদমতে এসে তাঁকে এর সংবাদ দিলে তিনি বললেন, এটা আমাদের মসজিদের জন্য দান করো আর এর সাওয়াব তোমারই থাকবে। তাঁরা বললেন, হ্যাঁ।

তিনি আবার বললেন, যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, সেই আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা করছি, তোমরা কি অবগত আছ যে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি 'রুমা' নামক কূপটি খরিদ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন? আমি তা এত এত মূল্যে খরিদ করে রাসুল (সাঃ) এর কাছে এসে তাঁকে সংবাদ দিলে তিনি বললেন, তুমি তা মুসলিমদের জন্য পানি পানের স্থান করে দাও, তার সাওয়াব হবে তোমার। তাঁরা বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই।

তিনি আবার বললেন, তোমাদের ওই আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তোমরা কি অবগত আছ যে, রাসুল উপস্থিত লোকদের দিকে লক্ষ করে বললেন, এ জাইশে উসরাতকে (তাবুকের সেনাবাহিনীকে) যে ব্যক্তি যুদ্ধের সামান দিয়ে সজ্জিত করবে, তাকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন? আমি তাঁদের এমনভাবে সজ্জিত করলাম যে, কেউ উটের একটি রশিও কম পায়নি। তাঁরা বললেন, আল্লাহর কসম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাকো; হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো; হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো।" (সুনানুন নাসায়ি: ৩১৮২, ৩৬০৬, ৩৬০৭; মুসনাদু আহমাদ: ৫১১)

উসমান রা. ছিলেন সবরের মূর্তপ্রতীক। মিশর, বসরা ও কুফার বিদ্রোহী গোষ্ঠী একাট্টা হয়ে ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় সমবেত হয়ে খলিফার পদত্যাগ দাবি করলে তিনি পদত্যাগে অস্বীকৃতি জানান। ফলে তারা হত্যার হুমকি দিয়ে তাঁকে অবরুদ্ধ করে রাখে। বিশাল মুসলিম জাহানের খলিফা হিসেবে মুষ্টিমেয় বিদ্রোহীকে কঠোর শাস্তিদানের পরিবর্তে তিনি তাদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে থাকলেন। এমনকি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) ও যায়েদ ইবনে সাদ (রাঃ) বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়তে চাইলে তিনি অনুমতি দেননি।

পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়ে উঠলে খলিফা অশ্রুসিক্ত নয়নে ব্যথিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন- "আমি মহান আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করছি, যাঁর কাছে আমার দশটি আমানত সুরক্ষিত রয়েছে। সেগুলো হলো:

১. ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে আমি চতুর্থ।

২. রাসূল (সাঃ) তাঁর কন্যাকে আমার সাথে বিয়ে দিয়েছেন।

৩. রুকাইয়ার মৃত্যুর পর নবিজি (সাঃ) তাঁর দ্বিতীয় কন্যাকেও আমার সাথে বিয়ে দিয়েছেন।

৪. আমি জীবনে কখনও অশ্লীল কথা উচ্চারণ করিনি।

৫. আমি সজ্ঞানে কখনও আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করার ইচ্ছা পোষণ করিনি।

৬. মুসলিম হওয়ার পর থেকে আমি প্রতি জুমাবার একজন গোলাম আজাদ করে আসছি।

৭. আমার সমগ্র জীবনে কোনোদিন ব্যভিচারে লিপ্ত হইনি।

৮. রাসূল (সাঃ) এর সাথে যে ডান হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছি, সে হাত দ্বারা আর কখনও লজ্জাস্থান স্পর্শ করিনি।

৯. মুসলিম হওয়ার আগে বা পরে আমি কখনও কারও সম্পদ আত্মসাৎ করিনি।

১০. নবি (সাঃ) এর উপস্থিতিতে আমি সম্পূর্ণ কুরআন হিফজ করেছি।

জুমাবার, খলিফা উসমান (রাঃ) ছিলেন রোজাদার। ভোরে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, রাসুল (সাঃ) আবু বকর ও উমর (রাঃ) কে সাথে নিয়ে উসমানকে ডেকে বলছেন- 'উসমান। শীঘ্রই চলে এসো, আমি তোমার সাথে ইফতারের অপেক্ষায় আছি।' ঘুম থেকে উঠে খলিফা স্ত্রীকে বললেন-'আমার শাহাদাত আসন্ন। বিদ্রোহীরা আজই আমাকে হত্যা করবে।' তিনি নতুন জামা ও পাজামা পরিধান করলেন। কুরআন হাতে নিলেন। যে কুরআনের সাথে ছিল তাঁর সারা জীবনের নিবিড় সম্পর্ক। তিনি ছিলেন হাফিজুল কুরআন ও জামিউল কুরআন (কুরআন সংকলনকারী)। তিলাওয়াতে মশগুল হলেন খলিফাতুল মুসলিমিন উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)। ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুন বিদ্রোহীরা আসরের নামাজের পর ৮২ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ খলিফাকে অত্যন্ত বর্বরোচিতভাবে পবিত্র কুরআন পাঠরত অবস্থায় শহিদ করে।

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ)
সাদাসিধা জীবনযাপনকারী খলিফা

হযরত আলী (রাঃ) কিশোরদের মধ্যে প্রথম ইসলাম করেছিলেন। তিনি আহলে বাইতের অন্যতম সদস্য। তিনি ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা। রাসূল (সাঃ) তাঁকে অনেক স্নেহ করতেন। শৈশব থেকেই তিনি নবি (সাঃ) এর কাছে লালিত-পালিত হন। রাসূল (সাঃ) এর

সাথে সর্বপ্রথম খাদিজা ও আলী (রাঃ) সালাত আদায় করেন। হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন ইসলামের প্রথম ফিদায়ি। বদর, উহুদ সহ অনেক যুদ্ধে সরাসরি উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হিজরতের সময় তিনি নিজের প্রাণের নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করে রাসূল (সাঃ) এর বিছানায় রাসূল (সাঃ) এর চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিলেন। রাসূল (সাঃ) বলেন-

مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ كُنْتُ مَنْ

"আমি যার মাওলা (বন্ধু), আলিও তার মাওলা।" (সুনানুত তিরমিযী: ৩৭১৩; সুনানু ইবনি মাজাহ: ১২১)

হযরত আলী (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এর সাথে ইসলামের প্রতিটি যুদ্ধে বীরত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। বদর যুদ্ধে তাঁর বিশেষ বীরত্বের জন্য রাসূল (সাঃ) তাঁকে 'জুলফিকার' নামক তরবারি উপহার দেন। তাবুকযুদ্ধে যাওয়ার সময় আল্লাহর রাসুল (সাঃ) তাঁকে মদিনায় স্থলাভিষিক্ত হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন।

খাইবারে ইহুদিদের সুরক্ষিত কামুস দুর্গের ফটক হযরত আলী (রাঃ) একাই উপড়ে ফেলেন। অথচ পূর্বে আরও অনেক বীর সাহাবী সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করেও তা পারেননি। তাঁর অসামান্য বীরত্বের জন্য রাসূল (সাঃ) তাঁকে 'আসাদুল্লাহ' বা শেরে খোদা বা আল্লাহর সিংহ উপাধিতে ভূষিত করেন। সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন; রাসুল (সাঃ) বলেন-

اللَّهُ يَفْتَحُ وَرَسُولَهُ اللهَ يُحِبُّ :قَالَ أَوْ وَرَسُولُهُ اللهُ يُحِبُّهُ رَجُلٌ غَدًا لَيَأْخُذَنَّ قَالَ أَوْ الرَّايَةَ لَأُعْطِيَنَّ عَلَيْهِ اللَّهُ فَتَحَ ﷺ اللَّهِ رَسُولُ فَأَعْطَاهُ عَلِيٌّ هَذَا :فَقَالُوا تَرْجُوهُ وَمَا بِعَلِيٍّ نَحْنُ فَإِذَا عَلَيْهِ

"আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দেবো, কিংবা (বলেন) আগামীকাল এমন এক ব্যক্তি পতাকা গ্রহণ করবে, যাঁকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ভালোবাসেন। অথবা তিনি বলেছিলেন, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসে। আল্লাহ তাআলা তাঁরই হাতে খায়বার বিজয় দান করবেন। হঠাৎ আমরা দেখতে পেলাম, আলি এসে হাজির; অথচ আমরা তাঁর আগমন আশা করিনি। লোকেরা বলে উঠল, এই যে আলি চলে এসেছেন। তখন আল্লাহর রাসুল তাঁকে পতাকা প্রদান করলেন। আর আল্লাহ তাআলা তাঁরই হাতে বিজয় দিলেন।" (সহিহ বুখারি: ২৯৭৫)

এমনকি আল্লাহর রাসুল (সাঃ) তাঁকে হারুন (আঃ) এর সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলেন-

بَعْدِي نُبُوَّةَ لَا أَنَّهُ إِلَّا مُوسَى؟ مِنْ هَارُونَ بِمَنْزِلَةِ مِنِّي تَكُونَ أَنْ تَرْضَى أَمَا

“তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার মর্যাদা আমার কাছে মুসার কাছে হারুনের মতোই? কিন্তু (পার্থক্য এই যে,) আমার পরবর্তী সময়ে আর কোনো নবি নেই।” (সহিহ মুসলিম: ২৪০৪; সহিহ বুখারি: ৩৭০৬)

আলী (রাঃ) নবি (সাঃ) এর সাথে নিজেকে এমনভাবে জড়িয়ে নিয়েছিলেন যে, তিনি বলতেন- "আমি নবিজির সাথে সাথে এমনভাবে চলতাম, যেভাবে উটের বাচ্চা তার মায়ের সাথে চলাচল করে।”

ইলমের দিক থেকে আলী (রাঃ) এর অবস্থান অনন্য। জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। সাহিত্য, কাব্য, ব্যাকরণ, নীতিশাস্ত্র, দর্শন, নববি পাঠশালার জ্ঞান অথবা আল্লাহ প্রদত্ত নিগূঢ় প্রজ্ঞা-সব ক্ষেত্রেই আলী (রাঃ) এর জানাশোনার গভীরতা ছিল উপমাহীন। তাঁর রচিত কাব্যসংকলন **দিওয়ানু আলী** আরবি সাহিত্যের এক অমূল্য রত্ন। আরবি ভাষার আজ যে কাওয়ায়েদ তথা ব্যাকরণের অগ্রদূত হচ্ছেন আলী (রাঃ)। আলী (রাঃ) এর তত্ত্বাবধানে আবুল আসওয়াদ (রহঃ) প্রথম আরবি ব্যাকরণ রচনা করেন।

আমিরে মুয়াবিয়া (রাঃ) একদিন আলীর বন্ধু যারা ইবনে যামরার কাছে আলী (রাঃ) এর চরিত্র বর্ণনা করতে অনুরোধ করলে ইবনে যামরা বলেন-'আলী রা. ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী, দুঃসাহসী, শক্তিশালী, ন্যায়বিচারক। আলীর প্রতিটি কথা ছিল হিকমতপূর্ণ। দুনিয়ার প্রতি ছিল তাঁর অনাসক্তি। তিনি ছিলেন পরকালের প্রতি চিন্তামগ্ন, সাদাসিধা পোশাক পরিধানকারী, মানবতার অকৃত্রিম বন্ধু, ন্যায়ের সমর্থক ও অন্যায়ের ঘোর বিরোধী। এসব ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।' বর্ণনা শুনে মুয়াবিয়া রা.-সহ অন্যান্য যারা উপস্থিত ছিলেন, সকলে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। অতঃপর আমিরে মুয়াবিয়া রা. মন্তব্য করেন-'আল্লাহ শপথ! আলী রা. এমন গুণের অধিকারী ছিলেন।’

হযরত ওমর (রাঃ) আলী (রাঃ) সম্পর্কে বলেছিলেন-

عَلِيٌّ أَقْضَانَا

“আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ফায়সালাকারী হচ্ছেন আলী।” (ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ২, পৃ. ২৯৩, হাদিস: ২৫৩৫-২৫৩৮)

طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيٌّ وَأَقْضَاهُمْ

“তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিচারক আলী।” (ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৫৫, হাদিস: ১৫৪)

তাঁর সঠিক সিদ্ধান্ত লক্ষ করে হযরত ওমর (রাঃ) একাধিকবার বলেছেন-
عُمَرُ لَهَلَكَ عَلِيٌّ لَوْلَا

“আলী না হলে ওমর হালাক হয়ে যেত।” (শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী, সিয়ারুস সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম, খ. ১, পৃ. ২৮৭)

আলি (রাঃ) নিজে বলেন-
يُبْغِضَنِي وَلَا مُؤْمِنٌ إِلَّا يُحِبَّنِي لا أَن إِلَيَّ اللهُ الْأُمِّيِّ النَّبِيِّ لَعَهْدُ إِنَّهُ النَّسَمَةَ وَبَرَأَ الْحَبَّةَ فَلَقَ وَالَّذِي مُنَافِقٌ إِلَّا

“সে মহান সত্তার কসম, যিনি বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম করেন এবং জীবকুল সৃষ্টি করেন, নবি (সাঃ) আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, মুমিন ব্যক্তিই আমাকে ভালোবাসবে আর মুনাফিক ব্যক্তি আমার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে।”

হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ)
রাসূলুল্লাহর হাওয়ারি

হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) ছিলেন খাদিজা (রাঃ) এর ভাইয়ের ছেলে। রাসূল (সাঃ) এর ফুফুর ছেলে। নবি (সাঃ) যুবাইর (রাঃ) কে অনেক স্নেহ করতেন, আবার যুবাইর (রাঃ)ও রাসূল (সাঃ) কে অনেক ভালোবাসতেন। রাসূল (সাঃ) এর সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক থাকার কারণে তাঁর ইপাধি হয় ‘হয়াপয়ারিয়ু রাসূলিল্লাহ’ বা আল্লাহর রাসূলের হাওয়ারি বা সাথি।

তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণের পরের দিন ১৫ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তার চাচা নওফাল ইবনে খুওয়াইলিদ তার ওপর চালাতেন নানা রকম নির্যাতন, এমনকি নিজের এই ভাতিজাকে তিনি চাটাই ও মাদুরের মধ্যে প্যাঁচিয়ে তার একপাশে আগুন ধরিয়ে দিতেন। ধীরে ধীরে আগুন জ্বলে তার শরীর ঝলসে দিত এবং চোখে ও কানে ধোঁয়া ঢুকত। বিশেষত নাক দিয়ে ঢুকে ফুসফুসকে চরমভাবে আক্রান্ত করত। এমন অবস্থা হতো যে, দম বন্ধ হয়ে তিনি মরে যাবেন।

তীব্র ধোঁয়ায় কাশতে কাশতে যখন তার জীবন বিপন্ন হয়ে উঠত, তখন তাঁর চাচা তাঁকে বলতেন-
‘আপন ধর্মে ফিরে এসো...’

তিনি জবাবে বলতেন-
‘কস্মিনকালেও আমি ইসলাম ছাড়ব না।’

হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) হাবশায় হিজরতকারীদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি হাবশা থেকে ফিরে আসার পর মক্কার মুশরিকরা রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে প্রচার করতে লাগল-

'তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

এই কথা শোনামাত্রই সাহসী তরুণ যবাইর (রাঃ) খাপ থেকে একটানে তরবারি বের করে উচু করে ধরে মানুষের ভিড ঠেলে এগিয়ে যেতে থাকলেন এবং মক্কার উচু অঞ্চলে পৌঁছে গেলেন। তাকে এভাবে খাপমুক্ত তলোয়ার উচিয়ে অস্থির ভঙ্গিতে দেখে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন-

'তোমার কী হলো যুবাইর? এত পেরেশান কেন?'

তিনি জবাব দিলেন,

'শুনলাম মুশরিকরা নাকি আপনাকে ধরে এনেছে? আমি আল্লাহর রাসূলের খুনের বদলা নিততে বের হয়েছিলাম'

রাসূল (সাঃ) তার প্রতি প্রীত হন, তাঁর ও তাঁর তলোয়ারের কল্যাণ কামনা করেন। আর এর মাধ্যমে তাঁর তরবারি ইসলামে উত্তোলিত সর্বপ্রথম তরবারির গৌরব আখ্যা পায়।

বদর যুদ্ধে যুবাইর (রাঃ) ঘোড়ার পিঠে চড়ে হলুদ পাগড়ি বেঁধে যুদ্ধ করছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (সাঃ) কে যে ফেরেশতাদের দ্বারা এই যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন তাদের মাথাতেও হলুদ পাগড়ি বাঁধা দেখে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন-
الزُّبَيْرِ سِيْمَا عَلَى نَزَلَتْ الْمَلَائِكَةَ إِنَّ

'ফেরেশতাগণ নাজিল হয়েছিলেন যুবাইরের আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।'

ওহুদ যুদ্ধের দিন যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এর হাতে বাইআত গ্রহণ করে এ যুদ্ধে জীবন উৎসর্গের শপথ করে সেই বাইআতের ভিত্তিতে মরণপণ করে লড়াই করেছিলেন। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর যখন শোচনীয় অবস্থা ও এক অশ্বারোহী মুশরিক মুসলিমদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিল তখন রাসূল (সাঃ) তাঁকে বললেন-

'যুবাইর, ওই ব্যাটাকে ধরো...'

প্রিয় নবী (সাঃ) এর কথাটি কানে পড়ামাত্রই তিনি আহত সিংহের মতো মুশরিক ব্যক্তির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দুই হাতে লোকটির গলা জড়িয়ে ধরে টেনে তাকে মাটিতে নামিয়ে ফেললেন এবং তাকে জড়িয়ে ধরে রেখেই পল্টি খেতে থাকলেন। এক সময় তাকে নিচে ফেলে তিনি ওর বুকের ওপর চড়ে বসলেন এবং তাকে হত্যা করে ফেললেন। এই দৃশ্য দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে উঠলেন, 'আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত।'

মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল (সাঃ) যে ক্ষুদ্র দলটিতে ছিলেন, সেই দলের পতাকাবাহী ছিলেন যুবাইর (রাঃ)। মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (সাঃ) নিজ হাতে যুবাইর (রাঃ) এর মুখের ধুলাবালি ঝেড়ে দিয়েছিলেন।

এছাড়াও হযরত উমর (রাঃ) এর খিলাফতকালে যুবাইর (রাঃ) কে মিশরে মুসলিম বাহিনীর সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিলেন ও উমর (রাঃ) তাঁকে এক হাজার সৈন্যের সাথে তুলনা করেছিলেন।

হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রাঃ)
এক জীবন্ত শহীদ

প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে হযরত তালহা (রাঃ) একজন ছিলেন। ইসলামের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ ও রাসূল (সাঃ) এর প্রতি ছিল সীমাহীন ভালোবাসা। ইসলাম গ্রহনের পর তালহা (রাঃ) এর ওপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়।

নওফাল ইবনে খুওয়াইলিদ তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাঃ) কে একটি রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে আর আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) কেও আরেকটি রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে মক্কার নির্বোধ ও দুষ্ট লোকদের হাতে সঁপে দিয়ে বলল, 'দেখব, এই যুগলবন্দীকে তোমরা কতটা শাস্তি দিতে পারো।'
এই ঘটনা থেকেই আবু বকর এবং তালহা (রাঃ) কে 'কারীনাইন' বা যুগলবন্দী বলা হয়।

বদর যুদ্ধের সময় রাসূল (সাঃ) তালহা (রাঃ) কে মদিনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভিন্ন একটি অভিযানে পাঠান, সেজন্য তিনি বদরে সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু সে সময় যেহেতু তিনি ভিন্ন আরেকটি সামরিক দায়িত্ব পালন করেছেন, সেজন্য তাঁকেও বদরি সাহাবি হিসেবে গণ্য করা হয় এবং রাসূল (সাঃ) তাঁকে বদরের গনিমতের অংশ প্রদান করেন।

উহুদ যুদ্ধে যখন তিরন্দাজ সৈনিকদের ভুলের কারণে মুসলিমরা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। খালিদের আক্রমণে ৭০ জন মুসলিম শাহাদাত বরণ করেন ও ইবনে কামিয়া এক কাফিরের আঘাতে (রাঃ) এর দাঁত মুবারক পড়ে যায়, ঠোঁট মুবারক হয়েছিল ক্ষত বিক্ষত, চেহারা মুবারকে অস্ত্রের ফালি ঢুকে পড়ার ফলে সেখান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছিল। প্রচণ্ড আঘাত, প্রচুর রক্তক্ষরণ তাঁকে দুর্বল ও নিস্তেজ করে ফেলেছিল। এমন নিদারুণ পরিস্থিতিতে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ আল-আনসারী (রাঃ) আক্রমণকারী বাহিনীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তালহা (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এর দিকে নিক্ষিপ্ত তিরগুলোকে নিজ পিঠে ধারণ করেছেন, যেন তির রাসূল (সাঃ) কে স্পর্শ করতে না পারে। সেইসাথে দৃঢ়ভাবে উন্মুক্ত তরবারি হাতে ধাবমান শত্রুকে প্রতিহত করে যাচ্ছিলেন তিনি। শরীরে আঘাতের যন্ত্রণা যখন তিনি আর সহ্য করতে পারছিলেন না, তখন নিজেকে বলে যাচ্ছিলেন-
‘হে তালহা! আমি কি আমার রক্ত, গোশত ও জীবনকে রাসূলের জন্য ওয়াকফ করে দিইনি?’ শেষে তালহা (রাঃ) আহত রাসূল (সাঃ) কে নিজের কাঁধে বহন করে পাহাড়ের পাদদেশে নিয়ে রাখলেন। রাসূল (সাঃ) কে নিরাপদে রাখতে পারার বদৌলতে নতুন মনোবলে শাণিত হয়ে প্রচণ্ড বেগে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং কাফিরদের আক্রমণের সক্ষমতা গুঁড়িয়ে দিয়ে প্রাণের চেয়ে প্রিয় রাসূলের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সম্পূর্ণ নিশ্চিত করতে সক্ষম হলেন।

ইতোমধ্যে আবু বকর (রাঃ) ও আবু উবাইদা ইবনুল জারারাহ রাসূল (সাঃ) এর খেদমতে দৌড়ে এলে নবিজি (সাঃ) বললেন-

طَلْحَةَ يُرِيدُ صَاحِبِكُمَا إِلَى وَانْصَرِنَا أُتْرُكَانِي

'আমার কাছে নয়, তোমরা তাড়াতাড়ি তালহার কাছে যাও।'

আবু বকর (রাঃ) বলেন- 'আমরা তালহার কাছে গিয়ে দেখি, প্রায় আশিটির মতো ছোট-বড় আঘাত তার সারা শরীরজুড়ে স্পষ্ট হয়ে আছে। বুকে ও পিঠে কোনো জায়গাই অক্ষত নেই। তির, তরবারি আর বর্শার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত আর রক্তস্নাত একটি মৃতপ্রায় দেহ বেহুঁশ পড়ে আছে। এক হাতের কবজি সম্পূর্ণ কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি গর্তে পড়ে আছে।'

ওহুদ যুদ্ধের পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় সময়ই বলতেন,

اللهِ عُبَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ إِلى فَلْيَنْظُرْ نَحْبَهُ قَضَى قَدْ الْأَرْضِ عَلَى يَمْشِي رَجُلٍ إِلى يَنْظُرَ أَنْ سَرَّه مَنْ

'প্রকৃতপক্ষে শাহাদাতপ্রাপ্ত-শহীদ, অথচ এখনো জমিনের বুকে চলমান-এমন ব্যক্তিকে দেখে কেউ যদি খুশি হতে চায়, সে যেন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহকে দেখে।'

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওহুদ যুদ্ধের প্রসঙ্গ এলেই বলতেন,

لِطَلْحَةَ كُلُّه يَوْمُ ذلِكَ

'ওহুদ যুদ্ধের সেই দিন! আহা! সেদিনের পুরো কৃতিত্বটাই ছিল তালহার দখলে।'

এজন্যই তালহা (রাঃ) 'আশশাহীদুল হাই' বা জীবন্ত শহীদ বলা হয়।

উমর (রাঃ) তালহা (রাঃ) এর ব্যাপারে বলেন-

رَاضٍ عَنْهُ وَهُوَ وسلم عليه الله صلى النَّبِيُّ تُوُفِّيِ

"মৃত্যু অবধি রাসূল সা. তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।"

এছাড়াও রাসূল (সাঃ) তাঁকে 'মহান তালহা' ' সর্বশ্রেষ্ঠ তালহা' (তালহাতুল খায়র) ও 'দানবীর তালহা' (তালহাতুল জুদ) বলে ডাকতেন।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)
সাহিবুল হিজরাতাইন

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী আট জনের মধ্যে তিনি একজন। তাঁর মুল নাম ছিল আবদু আমর তথা আমরের দাশ। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (সাঃ) তাঁর নাম রাখেন আবদুর রহমান।

ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশরা তাঁর ওপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিলে, রাসূল (সাঃ) তাকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার নির্দেশ দিলে, তিনি আবিসিনিয়া লয় হিজরত করেন। আবার রাসূল (সাঃ) মদিনায় হিজরত করলে তিনিও মদিনায় হিজরত করেন। আবিসিনিয়া ও মদিনায়- এই দুই স্থানে হিজরত করার কারণে তাকে সাহিবুল হিজরাতাইন বলা হয়।

ইসলামের প্রথম জিহাদ বদরের যুদ্ধে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) জান-প্রাণ দিয়ে লড়াই চালিয়ে যান ও আল্লাহর দুশমন উমাইর ইবনে উসমান ইবনে কাআব কে হত্যা করেন।

ওহুদের প্রান্তরে মুসলিমবাহিনী যখন চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল, পলায়নপর মুশরিকদের কর্তৃক পেছন দিক থেকে হঠাৎ অপ্রস্তুত মুসলিমবাহিনী যখন পালিয়ে যাচ্ছিলেম তখন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) কাফেরদের বিরুদ্ধে আঘাতের পর আঘাত হানে। যুদ্ধ শেষে তার শরীরে ২০টিরও বেশি জখমের চিহ্ন ছিল। কোনো কোনো আঘাত এতটাই গভীর ছিল যে সেখানে মানুষের হাত ঢুকে যাবে। কিন্তু তিনি আর্থিক জিহাদের তুলনায় শারিরীক জিহাদকে সামান্য মনে করতেন।

রাসুল (সাঃ) কাফের-মুশরিকদের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন ও অভিযানের জন্য তহবিল সংগ্রহের প্রয়োজনে সাহাবায়ে কেরামকে আহ্বান জানিয়ে বললেন-
بَعْثًا أَبْعَثَ أَنْ أُرِيْدُ فَإِنِّىْ تَصَدَّاقُو

“হে আমার প্রিয় সাহাবীরা! আমি মুশরিকেদর বিরুদ্ধে ছোট সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে যাচ্ছি। সূতরাং তেমরা যথাসাধ্য এর জন্য দান করে।”

এ আহ্বান শোনা মাত্রই হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বাড়ির দিকে দৌড়ে যান ও কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলেন-

“ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কাছে চার হাজার দিনার ছিল। দুই হাজার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খুশির জন্য দান করলাম আর দুই হাজার পরিবার বর্গের জন্য রেখে এলাম”

রাসূল (সাঃ) এই দানের কথা শুনে বললেন-

أَمْسَكْتَ فِيْمَا اَللّٰهُ بَارَكَ وَ - أَعْطَيْتَ فِيْمَا اَللّٰهُ بَارَكَ

“তুমি যা দিলে, আল্লাহ তাতে বরকত দান করুন এবং যা রাখলে আল্লাহ তাতেও বরকত দান করুন।”

এছাড়াও তাবুক যুদ্ধের সময় তিনি ২০০ উকিয়া স্বর্ণ (প্রায় এক বস্তা স্বর্ণখন্ড) দান করেন। তাঁর দানের অবস্থা দেখে রাসূল (সা:) এর কাছে উমর (রাঃ) মন্তব্য করলেন-

شَيْءًا لِأَهْلِهِ تَرَكَ فَمَا - إِثْمًا مُرْتَكِبًا اِلَّا الرَّحْمَنِ عَبْدَ لَأرى اِنِّى

“আমার মনে হয় আবদুর রহমানের এটা অন্যায় হলো, সে পরিবারের জন্য, কিছুই না রেখে একেবারে সবই দান করে দিল।”

তখন রাসূল (সাঃ) তাঁর পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন-
“দানকারীর জন্য আল্লাহ ও রাসূলের ওয়াদা রেখে এসেছি। তাদের জন্য রেখেছি উত্তম পুরষ্কার, কল্যাণ ও রিযিকের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি।

তাবুক যুদ্ধে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) এক বিরল সম্মানপ ভূষিত হন। তা হলো-
সৈন্যদল তাবুকে পৌঁছানোর পর নামাজের সময় হয়ে গেলে সেই মুহূর্তে রাসূল (সাঃ) সেখানে উপস্থিত না থাকায় হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) নামাজ পড়ানো শুরু করেন। প্রথম রাকাআতের মাঝেই রাসূল (সাঃ) চলে আসেন ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) এর পিছনে মুক্তাদি হিসেবে নামাজ আদায় শুরু করেন। যিনি সকল নবী-রাসূলের ইমাম সেই নবি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ইমাম হওয়ার মতো সম্মান ও মর্যাদার বিষয় আর কি হতে পারে!

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রাঃ) প্রায়ই তাঁর জন্য এই বলে দু'আ করতেন-

“আল্লাহ তাকে যেন জান্নাতের “সালসাবীল” ঝরনার পানি দিয়ে পরিতৃপ্ত করেন”

হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ)
উম্মতের আমানতদার

হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) একদম শুরুতে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম। আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণের পরের দিন আবু বকর (রাঃ) এর কাছে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন, লাজুক, বিনয়ী, মেধাবী ও সাহসী। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) তার সম্পর্কে বলেন-

"কুরাইশদের তিন ব্যক্তি সকলের চেয়ে সুন্দর চেহারা, উন্নত চরিত্র ও লজ্জাশীলতার জন্য শ্রেষ্ঠ। তাঁরা হলেন আবু বকর, উসমান ইবনে আফফান ও আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাঃ)।"

আবু উবায়দা (রাঃ) এর চরিত্রে আমানতদারির গুণটি এত বেশি উজ্জ্বলতা নিয়ে হাজির হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে 'উম্মতের আমানতদার' হিসেবে অভিহিত করেন। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন-

الْجَرَّاحِ بْنُ عُبَيْدَةَ أَبُو الأُمَّةِ هَذِهِ وَأَمِينُ أَمِينٌ، أُمَّةٍ لِكُلِّ

"প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন আমিন (বিশেষ আমানতদার ব্যক্তি) থাকেন। এই উম্মতের আমিন হলো আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ।" বুখারি: ৪৩৮২

শুধু ধনসম্পদ, কথাবার্তার আমানতই নয়; বিশ্বাসের আমানত সুরক্ষায়ও আবু উবায়দা ছিলেন অনন্য উচ্চতার অধিকারী।

বদর যুদ্ধে আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) বেপরোয়াভাবে যুদ্ধ করার সময় বারংবার তাঁর কাফির পিতা আব্দুল্লাহ ইবনুল জাররাহ তাঁর সামনে বাঁধা হয়ে দাড়াচ্ছিলেন। আবু উবায়দা (রাঃ) বারবার পিতাকে এড়িয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু নাছোড়বান্দা তাঁর পিতা তাঁর পথ আগলে দাঁড়ালে তিনি আল্লাহর দুশমনদের ওপর আক্রমণ চালাতে অপারগ হয়ে

পড়েন ও শেষ পর্যন্ত পিতার মাথায় আঘাত করেন। ফলে তাঁর পিতার মাথা দুভাগ হয়ে তাঁর সামনেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

আবু উবায়দা (রাঃ) তাঁর পিতাকে নয় বরং তাঁর পিতার মধ্যেকার শিরকী অপশক্তিকে হত্যা করেছিল। এরই ফলে আল্লাহ তা'আলা আবু উবায়দা (রাঃ) ও তার পিতার ব্যাপারে আয়াত নাজিল করেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ۭ اُولٰۗىِٕكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ۭ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۭ اُولٰۗىِٕكَ حِزْبُ اللّٰهِ ۭ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

তুমি পাবে না এমন জাতিকে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে, বন্ধুত্ব করে তার সাথে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধীতা করে, যদিও তারা তাদের পিতা, অথবা পুত্র, অথবা ভাই, অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। এরাই, যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতসমূহে যার নিচে দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এরাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর দলই সফলকাম। (সূরা আল-মুজাদালাহ, আায়াতঃ ২২)

খ্রিস্টানদের একটি প্রতিনিধি দল নবি (সাঃ) এর কাছে এসে তাদের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ মালামালের ন্যায়ানুগ মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য কাউকে চাইলে নবি (সাঃ) তাদেরকে বিকালে আসতে বলেন ও তিনি শক্তিশালী ও আমানতদার কাউকে পাঠানোর ইচ্ছা পোষণ করেন। বিকালে নবি (সাঃ) তাদের সাথে আবু উবায়দা (রাঃ) কে পাঠান। আর এর মাধ্যমে আবু উবায়দা শক্তিশালী ও আমানতদার এই দুইটি গুণের অধিকারী হয়ে গেলেন।

উহুদ যুদ্ধে আবু উবায়দা (রাঃ) মুশরিকদের বর্শার সামনে নিজের বুক পেতে দিয়ে রাসূল (সাঃ) কে সুরক্ষা দিয়েছিলেন। লৌহ শিরস্ত্রাণের দুইটি পেরেক রাসূল (সাঃ) গাল মুবারকে বিদ্ধ হলে আবু উবায়দা (রাঃ) নিজের দাঁত দিয়ে টেনে পেরেক দুইটি বের করেন যাতে রাসূল (সাঃ) এর কষ্ট কম হয়। দাঁত দিয়ে পেরেক টেনে বের করার ফলে তাঁর সামনের দুই দাঁত ভেঙে যায়। আবু বকর (রাঃ) বলেন-
'যাদের সামনের দাঁত নেই তাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর মানুষ আবু উবায়দা।'

আবু উবায়দা (রাঃ) সত্য ও কল্যাণের প্রতি সর্বোত্তম শুভাকাঙ্ক্ষী ও শ্রেষ্ঠতম সহযোগিতা দানকারী। দায়িত্বশীলতা ও মমত্বের সাথে তিনি মুসলিম সেনাবাহিনী পরিচালনা করতেন।

সিরিয়া বিজয়ের পর হাজার হাজার সৈন্য প্লগ রোগে আক্রান্ত হয় ও মৃত্যবরণ করেন। এজন্য খলিফা উমর (রাঃ) দূতমারফত পত্র পাঠিয়ে আবু উবায়দা (রাঃ) মদিনায় ফিরে যেতে বললে তিনি ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব নাকোচ করেন ও সেখানেই মুহাজিরদের সাথে অবস্থান করার অনুমতি চান।

উমর (রাঃ) আবু উবায়দা (রাঃ) এর এ চিঠি পেয়ে ব্যাকুলভাবে কাঁদলেন। তাঁর কান্নায় লোকেরা জিজ্ঞাসা করেছিল- 'আমিরুল মুমিনিন, আবু উবায়দা কি ইন্তেকাল করেছেন?' তিনি বললেন-'না তবে তিনি মৃত্যুর পথে।' অল্প কিছুদিন পরই প্লেগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শহিদ হন।

মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ) তাঁর জানাযার ইমামতি করলেন। দাফন শেষে মুয়াজ (রাঃ) সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন-

"হে আবু উবাইদা! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আল্লাহর শপথ! তিনি ছিলেন আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী, বিনয়ের সাথে জমিনে বিচরণকারী। আপনি ছিলেন সেসব ব্যক্তিদের অন্যতম, যারা আল্লাহর ভয়ে সিজদায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায় রাত অতিবাহিতকারী। তিনি ছিলেন এমন, যারা খরচ করার সময় অপচয় করে না, আবার কার্পণ্যও করে না। আল্লাহর শপথ! তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও এতিম-মিসকিনদের প্রতি সহানুভূতিশীল।"

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)
তাওয়াক্কুলের এক অনন্য উদাহরণ

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) সতেরো বছর বয়সে ইসলাম গ্রহন করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূল (সাঃ) অনেক খুশি হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর মাম।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সা'দ (রাঃ) কে মামা হিসাবে পেয়ে নিজেকে সম্মানিত বোধ করতেন।

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন কয়েকজন সাহাবীর সঙ্গে বসেছিলেন। সে সময় সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) কে আসতে দেখে বললেন-

خَالَهُ امْرُءٌ فَلْيُرِنِي .... خَالِي هذَا

'এটা আমার মামা। কার আছে এমন মহান মামা!'

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) তাঁর মাকে খুবই ভালোবাসতেন। সা'দ (রাঃ) এর ওপর মায়ের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। সা'দ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর মা তাঁকে বলে, 'সা'দ যদি ইসলাম ত্যাগ না করে, তবে আমি আমি পানাহার ছেড়ে দিয়ে অভুক্ত থাকব।'। উত্তরে সা'দ (রাঃ) বললেন-

لِشَيْءٍ هَذَا دِينِي أَدَعُ لَا إِنِّي أُمَّ يَا تَفْعَلِي لَا

"আম্মাজান আপনি এমন করবেন না! আমি আমার দ্বীন কিছুতেই ত্যাগ করতে পারব না।"

সা'দ (রাঃ) এর মুখে একথা শুনে তাঁর না পানাহার বন্ধ করে দেন। তিনি দূর্বল হয়ে পড়লে সা'দ (রাঃ) কিছু খাওয়ার জন্য অনুরোধ করলে তিনি কঠিন শপথ করে বলেন সা'দ (রাঃ) পূর্বের ধর্মে ফিরে না গেলে তিনি না খেয়েই মারা যাবেন। তখন সা'দ (রাঃ) বলেন-

إِنْ لِشَيْءٍ هَذَا تَرَكْتُ مَا نَفْسًا نَفْسًا فَخَرَجَتْ نَفْسٍ مِائَةُ لَكِ كَانَتْ لَوْ أُمَّهُ يا وَاللهِ تَعْلَمِينَ .أُمَّهُ يَا
. تَأْكُلِي فَلَا شِئْتِ وَإِنْ فَكُلِي، شِئْتِ

"মা! আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহর কসম! আপনার যদি একশ প্রাণ থাকত আর সবগুলো একের পর এক বের হয়ে যেত, তবুও আমি আমার দ্বীন ত্যাগ করতাম না। এখন আপনার ইচ্ছে হলে খেতে পারেন আর ইচ্ছে না হলে নাও খেতে পারেন।" (মুসলিম: ১৭৪৮)

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

اِلَيَّ ۚ ثُطِعْهُمَا فَلَا عِلْمٌ بِهٖ لَكَ لَيْسَ مَا بِيْ لِتُشْرِكَ جَاهَدٰكَ وَاِنْ ۚ حُسْنًا بِوَالِدَيْهِ الْاِنْسَانَ وَوَصَّيْنَا
تَعْمَلُوْنَ كُنْتُمْ بِمَا فَاُنَبِّئُكُمْ مَرْجِعُكُمْ

"আর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করতে। তবে যদি তারা তোমার উপর প্রচেষ্টা চালায় আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। আমার দিকেই তোমাদের

প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যা করতে আমি তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেব।" (সূরা আল-আনকাবূত, আয়াতঃ ০৮)

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) প্রথম মুসলিম যিনি আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেন। তিনি নিজেও বলতেন,

اللَّهِ سَبِيلِ فِي بِسَهْمٍ رَمَى الْعَرَبِ لَأَوَّلُ إِنِّي

'আমি প্রথম আরব যে আল্লাহর জন্য তীর চালনা করেছিলাম।' (আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৫, পৃ. ২২, হাদিস: ৩৭২৮)

উহিদ যুদ্ধে তাঁর তীর চালনার নৈপুণ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বলেন-

وَأُمِّي أَبِي فِدَاكَ ارْمِ سَعَدُ ارْمِ

'বাহ, সাদ বাহ, আরও তীর ছুঁড়ো, তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক।'

রাসুলুল্লাহ (সাঃ), খুলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের নিকট হযরত সা'দ (রাঃ)এর মর্যাদা ও গুরুত্ব ছিল অতি উচ্চে। তাঁরা তাঁর মতামতকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করতেন। একবার হযরত সা'দ (রাঃ) মোজার ওপর মসেহ সংক্রান্ত একটি হাদিস বর্ণনা করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) তাঁর পিতা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) থেকে হাদিসটির সত্যতা যাচাই করতে চাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হাদিসটি কি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস থেকে শুনেছ? বললেন, 'হ্যাঁ। হযরত ওমর (রাঃ)) বললেন, হ্যাঁ, সা'দ যখন তোমাদের নিকট কোনো হাদিস বর্ণনা করে, তখন সে সম্পর্কে অন্য কারো নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করবে না।'

ইবনে ইসহাক (রহ.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে চারজন ছিলেন সর্বাধিক কঠোর: হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত যুবাইর, হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবদ্দশায় হযরত বিলাল (রাঃ) এর অনুপস্থিতিতে হযরত সা'দ (রাঃ) তিনবার আযান দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'আমার সঙ্গে বিলালকে না দেখলে তুমি আযান দেবে।" (মুহাম্মদ ইউসুফ আল-কান্ধলওয়ী, হায়াতুস সাহাবা, খ. ৪, পৃ. ১৫২)

হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ)
আল্লাহর পথে সদা নির্ভয়

হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর পূর্বসুরিরা এক ইলাহে বিশ্বাসী ছিল। তাঁর পিতা যায়েদ ইবনে আমর সত্যের সন্ধানে সিরিয়া গমন করেন। সিরিয়া থেকে মক্কায় আসার পথে খাইবারে বেদুইনদের হাতে যায়েদ ইবনে আমর আক্রান্ত হয়ে নিহত হন। মৃত্যুর আগমুহূর্তে আকাশের দিকে হাত তুলে যায়েদ ইবনে আমর মোনাজাত করে বলেন-

"হে প্রভু, তুমি আমাকে শেষ নবির আগমন পর্যন্ত জীবিত রাখলে না। মহাকল্যাণ থেকে আমি মাহরুম হলাম। তবে আমার পুত্র সাঈদকে এ কল্যাণ থেকে মাহরুম করো না।"

সাঈদের জন্য পিতার এ মোনাজাত কবুল হয়েছে। মহানবি (সাঃ) এর নবুওয়াতি দাওয়াতের সূচনালগ্নেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সেসময় সাঈদের বয়স মাত্র বিশ। তাঁর স্ত্রী ফাতিমাও ইসলাম গ্রহণ করেন। ফাতিমা ছিলেন উমর ফারুক (রাঃ) এর বোন।

ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরা উভয়ে নির্যাতিত হন এবং অবিচলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। উমর ফারুক (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণের যুগান্তকারী ঘটনায় সাঈদ ইবনে যায়েদ ও তাঁর স্ত্রী ফাতিমার সাহসী ভূমিকা অক্ষয় হয়ে আছে।

সাঈদের কাছে জিহাদই ছিল সবচেয়ে প্রিয় আমল। ভয়াবহ সব যুদ্ধের ময়দানেও সাঈদ ছিলেন অকুতোভয় বীর। অগণিত তির, নেজার আক্রমণের মধ্যেও অসংখ্য শত্রুর সামনে সাঈদ ছিলেন নির্ভয়। বদর যুদ্ধ ছাড়া তিনি সকল যুদ্ধেই অংশ গ্রহণ করেন।

জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ১০ জন সাহাবীর মধ্যে তিনি একজন।
তিনি নিজেই বর্ণনা করেন-

وَعَبْدُ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَلِيٌّ وَعُثْمَانُ الْجَنَّةِ فِي وَعُمَرُ الْجَنَّةِ فِي بَكْرٍ أَبُو الْجَنَّةِ فِي عَشَرَةٌ قَالَ الْقَوْمُ فَقَالَ الْعَاشِرِ عَنِ وَسَكَتَ التَّسْعَةَ هُؤُلَاءِ فَعَدَّ قَالَ .وَقَاصٍ أَبِي بْنُ وَسَعْدُ عُبَيْدَةَ وَأَبُو الرَّحْمَنِ الْجَنَّةِ فِي الأَعْوَرِ أَبُو بِاللهِ نَشَدْتُمُونِي قَالَ الْعَاشِرُ مَنِ الْأَعْوَرِ أَبَا يَا اللَّهَ نَنْشُدُكَ

"রাসূল (সাঃ) বলেন-'দশজন ব্যক্তি জান্নাতি। আবু বকর জান্নাতি, উমর জান্নাতি এবং আলী, উসমান, যুবাইর, তালহা, আবদুর রহমান, আবু উবাইদা ও সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস

জান্নাতি।' রাবি বলেন, সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) উক্ত নয়জনকে গুনে গুনে নাম বললেন এবং দশম জন প্রসঙ্গে নীরব থাকেন। সে সময় লোকেরা বলল, 'হে আবুল আওয়ার! আপনাকে আমরা আল্লাহর নামে কসম দিয়ে বলছি, দশম লোক কে?' সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বললেন, 'তোমরা যেহেতু আমাকে আল্লাহর নামে কসম দিয়ে প্রশ্ন করেছ, সেজন্য বলতে হচ্ছে! তাঁদের দশমজন হলেন আবুল আওয়ার।" (তিরমিযি: ৩৭৪৮)

আশারায়ে মুবাশশরাগণ ছাড়াও নিচে আরও কয়েকজন সাহাবির মর্যাদা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ (রাঃ)

সর্বপ্রথম যে কয়েকজন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বেলাল ইবনে রাবাহ (রাঃ) তাঁদের মধ্যে একজন। ইসলাম গ্রহনের পর কুরাইশদের কর্তৃক তাঁর মতো নির্যাতন অন্য কাউকে সহ্য করতে হয়নি। অন্য সাহাবীরা যখন কুরাইশদের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর প্রতি ঈমান ঠিক রেখে কাফেরদের চাহিদা পূরণ করে মৌখিক কিছু কথা বললেও বেলাল (রাঃ) ছিলেন সম্পূর্ণই ব্যতিক্রম। শত অত্যাচার করা হলেও রাসূল (রাঃ) এর বিরুদ্ধে একটি শব্দও বলেননি। চাবুকের আঘাত কিংবা বুকে পাথর চাপা দেওয়া অথবা মরুর উত্তপ্ত বালুর গলায় রশি বেঁধে টানা হলেও তাঁর কণ্ঠে আওয়াজ উঠত-
আহাদ, আহাদ। আল্লাহ এক—অদ্বিতীয়।

তিনিই হলেন ইসলামের সর্বপ্রথম মুআযযিন। রাসূল (সাঃ) এর হায়তের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি মসজিদে নববির মুয়াযযিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। নবি (সাঃ) যখন সালাত আদায় করতেন তখন তিনিও সালাত আদায় করতেন। নবিজি (সাঃ) যুদ্ধে গেলে বেলাল (রাঃ) হতেন তাঁর সহযোদ্ধা। সারাক্ষণ তিনি নবি (সাঃ) কে ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (সাঃ) এর সাথে কাবা শরীফের ভেতরে যে তিনজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি প্রবেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন বেলাল (রাঃ) তাঁদের একজন। রাসূল (সাঃ) এর আদেশ মোতাবেক তিনি কাবার ছাদে উঠে উচ্চ আওয়াজে আযান দেন।

বেলাল (রাঃ) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সেই হিসাবে তিনি বদরের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী। একদিন নবী (সাঃ) বেলাল (রাঃ) কে বললেন- কিসের বদৌলতে তুমি আমার আগেই

জান্নাতে চলে গেলে। গতরাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করে তোমার পায়ের খসখস আওয়াজ পেলাম। উত্তরে বেলাল বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কোনো গোনাহ করলে সঙ্গে সঙ্গে দু'রাকাত নামাজ আদায় করি। আর অজু চলে গেলে তখনি অজু করে দু'রাকাত নামাজ আদায় করি। নবীজি বলেন, এই দুই আমলের কারণেই তোমার এই মর্যাদা। (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ : ২১ : ৮৩, মুসনাদে আহমাদ : ২৩২৪)

উমর ফারুক (রাঃ) বেলাল (রাঃ) কে খুব ভালোবাসতেন এবং খুবই মর্যাদার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করতেন। এমনকি আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সম্পর্কে তাঁর সামনে আলোচনার প্রসঙ্গ এলে তিনি বলতেন-

سَيِّدَنَا أَعْتَقَ الَّذِي وَهُوَ سَيِّدُنَا بَكْرٍ أَبَا إِنَّ

'আবু বকর আমাদের একজন নেতা আর তিনিই আযাদ করেছিলেন আমাদের অন্য নেতা বেলালকে।'

হযরত হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)

হযরত হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর সমবয়সী। তিনি ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর চাচা ও দুধ ভাই।

তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের নামকরা সিংহপুরুষ। রাসূল (সাঃ) তাঁকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালে, তিনি ইসোাম গ্রহন করেননি। তবে আবু জাহল কর্তৃক মহানবী (সাঃ) কে গালাগালি করার কথা শোনা মাত্রই হযরত হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) আবু জাহলকে মেরে রক্তাক্ত করেন ও কালেমা পড়েন। হামযা (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে রাসূল (রাঃ) অনেক খুশি হন। হযরত হামযা (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানরা প্রকাশ্যে সালাত আদায় করা শুরু করে।

যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় হিজরত করলেন, সর্বপ্রথম তিনি ইসলামের পতাকা তুলে দিয়েছিলেন হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) এর হাতে। এটাই ছিল ইসলামের জন্য উত্তোলিত সর্বপ্রথম পতাকা। অবশ্য ভিন্নমতে ইসলামে সর্বপ্রথম পতাকা উত্তোলন করেন আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ)।

বদর যুদ্ধের দিন হামযা (রাঃ) মুশরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ যোদ্ধারূপ প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন দুশমন সৈনিকদের বুকে ত্রাস হয়ে। তিনি হত্যা করেছিলেন বড় বড় জাদরেল নেতাদের।

ওহুদের ময়দানে মুসলিম বাহিনীর চরম বিশৃঙ্খল ও পরাজয়ের অবস্থা দেখে হামযা (রাঃ) চিৎকার করে বলতে লাগলেন-
আমি আল্লাহর সিংহ, আমি রাসূলুল্লাহর সিংহ
হে আল্লাহ, মুশরিক বাহিনী তোমার দীন মেটানোর উদ্দেশ্যে যা করেছে, তার সঙ্গে আমার কোনো সংশ্রব নেই...
হে আল্লাহ, মুসলিম বাহিনী যেভাবে তোমার নবী থেকে দূরে সরে গেছে, এদের পাপের শাস্তি আমাকে দিয়ো না। আমি ময়দান ছেড়ে পালাব না। আমি আসাদুল্লাহ...'

এরপর তিনি সিংহের মতো ডানে-বামে দুর্দান্ত গতিতে তরবারি চালাতে থাকলেন, হঠাৎ ওয়াহশী নামের এক হাবশী ক্রীতদাসের গোপন আক্রমণে তিনি শহীদ হয়ে লুটিয়ে পড়েন জমিনে। উহুদের যুদ্ধে তিনি শহীদ হলে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে সাইয়্যিদুশ-শুহাদা বা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বসেরা শহিদ উপাধি দান করেন।

হযরত হামযা (রাঃ) হলেন আল্লাহর সিংহ, রাসূল (সাঃ) এর সিংহ এবং শাহাদাতপ্রাপৃত শহীদদের সরদার।

হযরত উবাই ইবনে কাআব (রাঃ)

হযরত উবাই ইবনে কাআব (রাঃ) মুসলিম জাতির এক বিরল প্রতিভা। রাসূল (সাঃ) যখন মুসআব ইবনে উমাইর (রাঃ) কে মদিনায় পাঠান তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আকাবার বাইআতে মদিনা থেকে মক্কায় আগত দলের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম সারিতে। এরপর রাসূল (সাঃ) যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন হযরত উবাই ইবনে কাআব (রাঃ) কে ওহী লেখক হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি রাসুল (সাঃ) এর পবিত্র জবান থেকে সুয অবতীর্ণ কুরআন তরতাজা রূপে শ্রবণ করতেন।

তিনি ছিলেন কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। কুরআনই ছিল তার হৃদয়ের প্রশান্তি, অন্তরের আনন্দ।

আল্লাহ তা'আলা উবাই ইবনে কাআব (রাঃ) কে এক অনন্য মর্যাদা দান করেন। আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সাঃ) কে উবাই ইবনে কাআব (রাঃ) কুরআন পড়ে শোনানোর নির্দেশ দেন।

হযরত উবাই ইবনে কাআব (রাঃ) সেই মহাসৌভাগ্যবান ছয়জনের একজন, যারা রাসূল (সাঃ) এর জীবদ্দশায় উদ্ভুত সমস্যা ও সংকট সমাধানে নিজেদের মত ফতোয়া প্রদান করতেন।

এছাড়াও তিনি ছিলেন মুসলিমদের নেতা। খলীফা উমর (রাঃ) তাঁকে আখ্যায়িত করতেন 'সাইয়্যিদুল মুসলিমীন' (মুসলিমদের নেতা) বলে।

হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব (রাঃ)

হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব (রাঃ) ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর চাচাতো ভাই। রাসূল (সাঃ) এর চেহারার সাথে তাঁর চেহারার এত মিল ছিল যে, অপরিচিতরা এবং দুর্বল দৃষ্টির লোকেরা বেশিরভাগ সময় তাঁর মাঝে এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মাঝে পার্থক্য করতে পারত না।

তিনি ও তার স্ত্রী একেবারে শুরুতেই হযরত আবু বকর (রাঃ) এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর কাফেররা মুসলমানদের ওপর নানাবিধ অত্যচার চালাতে থাকলে একপর্যায়ে রাসূল (সাঃ) মুসলানদের আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দেন। তখন জাফর ইবনে আবু তালিব (রাঃ) এর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম হিজরতকারী কাফেলা মক্কা থেকে মদিনায় পৌঁছে যায়। তাঁরা বাদশা নাজাশীর নিরাপদ আশ্রয়ে একাধারে দশ বছর নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিলেন।

হিজরতের সপ্তম বর্ষে তিনি একদল মুসলিমকে সঙ্গে নিয়ে হাবশা ছেড়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা করলেন। যখন তারা মদীনায় পৌঁছলেন, তখন রাসূল (সাঃ) খায়বার বিজয় শেষে মাত্র মদীনায় ফিরে এসেছেন। জাফর (রাঃ) কে দেখে তিনি খুবই খুশি হয়ে বললেন-

جَعْفَرَ؟ بِقُدُوْمٍ أَمْ خَيْبَرَ أَبِفَتْحِ !! فَرَحًا أَشَدُّ بِأَيِّهِمَا أَدْرِي مَا

‘জানি না আমি কিসে বেশি খুশি? খায়বার বিজয়ের আনন্দে নাকি জাফরের আগমনে।’

হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব (রাঃ) দূর্বল অসহায় মুসলিমদের খুব ভালবাসতেন। তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতেন। তাদের এত বিচি খোঁজ-খবর রাখতেন যে তাঁকে 'আবুল মিসকীন' তথা গরিবের বন্ধু উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

৮ম হিজরীতে মূতা প্রান্তরে মুসলিম ও রোমানদের মাঝে যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশ মোতাবেক সেনাপতি যায়োদ ইবনে হারেসা (রাঃ) শাহাদাত বরণ করলে জাফর ইবনে আবু তালিব (রাঃ) সেনাপতি হন এরপর ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়লেন এবং নিজের তরবারি দিয়ে সুন্দর সুঠামদেহী ঘোড়াটির সামনের দু'পা কেটে দিলেন। যেন শত্রুরা কেউ এটাকে কোনো কাজে লাগাতে না পারে।

তিনি মুসলিম সেনাদলের পতাকা নিজের নিয়ন্ত্রণে নিলেন। জান্নাতের কথা স্মরণ করে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে শত্রুবাহিনীর একেবারে ভেতরে ঢুকে যেতে লাগলেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে দুশমনের প্রচণ্ড এক আঘাতে তাঁর ডানহাত দেহ থেকে আলাদা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাম হাত দিয়ে পতাকা ধরে ফেললেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই আরেকটি প্রচণ্ড আঘাতে বাম হাতটিও শরীর থেকে পৃথক হয়ে গেল। তখন তিনি কাটা দুই হাতের বাকি অংশ দিয়ে পতাকাটিকে বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে রাখলেন। এরপর আরেকটি প্রচণ্ড আক্রমণে তাঁর শরীর দু'টুকরো হয়ে যায় ও শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব (রাঃ) এর মৃত্যুর সংবাদ তাঁর পরিবারের কাছে পৌঁছে দিয়ে অশ্রু মুছতে মুছতে সেখান থেকে বিদায় হলেন। কান্নাভেজা কণ্ঠে তিনি দুআ করছিলেন-
أَهْلِهِ فِي جَعْفَرًا اخْلُفْ اللَّهُمَّ وَلَدِهِ فِي جَعْفَرًا اخْلُفْ اللَّهُمَّ
'হে আল্লাহ! তুমিই জাফরের সন্তানদের দায়িত্ব গ্রহণ করো, ইয়া আল্লাহ! তুমিই জাফরের পরিবারকে হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করো।'

দুআ করার পর তিনি বললেন-
'জাফরকে আমি জান্নাতে দেখেছি, পাখির মতো দু'টি পাখায় ভর করে উড়ে বেড়াচ্ছে। তবে তার পাখা ও পালকগুলো ছিল তাজা রক্তে ভেজা।'

হযরত মুস'আব ইবনে উমাইর (রাঃ)

স্বচ্ছল জীবনের অধিকারী, স্বাস্থ্যবান, সতেজ তরুণ, টগবগে যুবক হযরত মুস'আব ইবনে উমাইর (রাঃ) ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের তাঁর অন্যান্য সাহাবীদের মতো তার ওপরে নেমে আসে কুরাইদের নির্যাতন। তাই তিনি হাবাশায় হিজরতকারী কাফেলার সাথে হাবাশায় হিজরত করেন। তিনি ২ বার হাবাশায় হিজরত করেন। ২য় বার হিজরত করলেও রাসূল (সাঃ) এর বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করতে না পেরে ফিরে আসেন।

তিনি ছায়ার মতো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে আঁকড়ে ধরে থাকলেন। তাঁর আদর্শ ও চরিত্র-মাধুরীর শিক্ষা নিলেন। ফলে তিনি সাহাবায়ে কেরামের মাঝে হয়ে উঠলেন অন্যতম সেরা কুরআনের হাফেয, ইসলামী শরীয়তের অন্যতম সেরা বোদ্ধা এবং রাসূল (সাঃ) এর সর্বাধিক হাদিস সংগ্রহকারীদের অন্যতম।

প্রথম আকাবার বাইআত সংঘটিত হওয়ার পর বাইআতকারীরা মদীনায় নিজেদের কওমের কাছে ফিরে গিয়ে কওমের লোকদের সত্য ও হেদায়েতের দীনের প্রতি দাওয়াত দিতে থাকলেন। এর কিছুদিন পর কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ও ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে হবেন বেশি অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন অনুভব করলেন। রাসূল (সাঃ) এর কাছে তাদের এ আবেদন পেশ করা হলে রাসূল (সাঃ) হযরত মুস'আব ইবনে উমাইর (রাঃ) কে পাঠালেন। ফলে ভূপৃষ্ঠে তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম সুসংবাদবাহী।

এমনকি তার নামে লেখা হয় এই বিরল সম্মানের কথা যে, প্রিয় নবী (সাঃ) মদীনায় আগমনের পূর্বে সর্বপ্রথম সেখানে জুমার জামাআত কায়েম করেন মুসআব (রাঃ)। তিনি এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) ছিলেন মদীনার প্রথম হিজরতকারী।

বদর যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) সাদা পতাকা দিলেন মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে। তিনি নিজের পবিত্র দুই হাতে পতাকাটি তাকে সমর্পণ করলেন। মুসআব (রাঃ) সেটা গ্রহণ করলেন সম্মানের সঙ্গে, আনন্দ প্রকাশ করে এবং সেটা হাতে নিয়ে মাথা উচু করে সেনাদলের আগে আগে চলতে লাগলেন।

বদর যুদ্ধের ন্যায় উহুদ যুদ্ধেও রাসূল (সাঃ) মুসআব (রাঃ) এর হাতে পতাকা সমর্পণ করেন। এ যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তেও হযরত মুস'আব ইবনে উমাইর (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এর পাশে দৃঢ়পদে অবস্থান করেন। তখন তাঁর সামনে এসে ইবনে কামিআ তাঁর হাতে তরবারি দিয়ে

চরম আঘাত করলে পতাকা ধরে রাখা হাত কেটে মাটিতে পড়ে যায়। এরপর তিনি সাথে সাথে অন্য হাতে পতাকা উঁচু করে ধরার পর ইবনে কামিআর আক্রমণে ২য় হাতটিও কেটে পড়ে যায়। এবার কেটে পড়া দুই হাতের বাহু একত্র করে তিনি ইসলামের পতাকা উঁচু করে রাখেন। দুরাচারী ইবনে কামিআ আবারও তার কাছে ফিরে এসে তৃতীয় আক্রমণ চালায় বর্শা ছুঁড়ে মারে তাঁর বুকে। তিনি শহিদ হয়ে মাটিতে পড়ে যান।

মুসআব (রাঃ) এর লাশ দাফন করার সময় কাফনে আবৃত মুসআব (রাঃ) এর পাশে এসে দাঁড়িয়ে রাসূল (সাঃ) আল্লাহর বাণী তিলাওয়াত করলেন-
“মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত তাদের প্রতিশ্রুতি সত্যে বাস্তবায়ন করেছে। তাদের কেউ কেউ [যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে] তার দায়িত্ব পূর্ণ করেছে, আবার কেউ কেউ [শাহাদাত বরণের] প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা (প্রতিশ্রুতিতে) কোন পরিবর্তনই করেনি।”

নারী সাহাবীদের মর্যাদা

ইসলামে পুরুষ সাহাবিদের ন্যায় নারী সাহাবিদের সংখ্যা কম নয়। এ সকল নারী সাহাবিরা আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা, সর্বোত্তম মানুষ, সর্বোত্তম উম্মত-যাদেরকে মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে, সম্মান ও ফযীলতের অধিকারী, উচ্চ স্তর ও ইসলাম গ্রহণে তারাই ছিলেন অগ্রগামী। আল্লাহ তাদের অন্তরগুলোকে তাকওয়ার জন্য বাছাই করেছেন, তাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন, তারাই তো ছিলেন প্রকৃত বিচক্ষণ জ্ঞানী। তাদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। আল্লাহ তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে সুসংবাদ দিচ্ছেন রহমত ও সন্তুষ্টির এবং এমন জান্নাতসমূহের যাতে রয়েছে তাদের জন্য স্থায়ী নেয়ামত। ইসলাম তাদেরকে দিয়েছে অনন্য মর্যাদা। নিচে কতিপয় নারী সাহাবিদের মর্যাদা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রাঃ)
বিশ্বের সকল নারীর নেত্রী

খাদিজা (রাঃ) হলেন নিজ সমশের বিশ্বের সকল নারীর নেত্রী। ইসলামের সূচনা লগ্নে তিনি ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর পরামর্শদাত্রী ও সাহায্যকারিণী। তিনি দ্বীনের দাওয়াতের জন্য সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতার হাত খুলে দেন। সাত আসমানের ওপর হতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি সালামপ্রাপ্তার অধিকারিণী হন। তাঁকে জান্নাতে মণি-মুক্তার তৈরি এমন একটি বাড়ির সুসংবাদ দেওয়া হয়-যাতে নেই কোনো চিৎকার-শোরগোল এবং ক্লান্তি বা কষ্টের লেশ। মুমিন নারীদের প্রথম অকৃত্রিম বন্ধু খাদীজা (রাঃ) কেবল সকল মুমিনদেরই জননী নন; বরং তিনি সকল মর্যাদা, গুণ ও শ্রেষ্ঠত্বেরও জননী।

তিনি দুনিয়াতে থাকতেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তা হন। রাসূল (সাঃ) নিজেই তাঁর প্রশংসা করেছেন। সকল উম্মুল মুমিনীনের মধ্যে তিনি সবার শ্রেষ্ঠ। তার সম্মান বর্ণনাতীত। এ ব্যাপারে আয়েশা (রাঃ) বলেন-

إِيَّاهَا وسلم عليه الله صلى اللَّهِ رَسُولِ ذِكْرِ كَثْرَةِ مِنْ خَدِيجَةَ عَلَى غِرْتُ مَا امْرَأَةٍ عَلَى غِرْتُ مَا

“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্য কোনো স্ত্রীর ব্যাপারে এত ঈর্ষা পোষণ করিনি, যতটুকু খাদীজা (রাঃ) এর প্রতি করেছি। যেহেতু রাসূল (সাঃ) তাঁর আলোচনা বেশি করতেন।” (সহীহ, বুখারী, হাদিস নং ৩৮১৭; সহীহ, মুসলিম, হাদিস নং ২৪৩৫)

জাহেলী যুগে সমকালীন কুরাইশ নারীদের মাঝে তিনি ‘আত-তাহিরা’ তথা নিষ্কলুষ ও পবিত্রা উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।
যুবাইর ইবনে বাক্কার বলেন- খাদীজা (রাঃ) কে জাহেলী যুগে 'তাহেরা' তথা নিষ্কলুষ। ও পবিত্রা নামে ডাকা হতো।

খাদিজা (রাঃ) আল্লাহর প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিলেন। রাসূল(সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসার বিন্দু পরিমাণ কমতি ছিল না খাদীজা (রাঃ)র। বুদ্ধিময়া ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে তিনি ঈমান আনেন রাসূল (সাঃ) এর প্রতি। অনুসরণ করতে থাকেন রাসূলের সব কাজ ও আমল-ইবাদত। একদিন রাসূল (সাঃ) খাদীজা (রাঃ) এর ঘরে ফিরে আসেন। এমন সময় জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে নামায পড়ান। খাদীজা (রাঃ) বিষয়টি জানতে পেরে বললেন, আমাকে তা শিখিয়ে দিন যা আপনাকে শিখিয়েছেন জিবরাঈল (আঃ)। রাসূল (সাঃ) তাঁকে দেখালেন এবং শেখালেন। এরপর খাদীজা (রাঃ) ওযু করলেন যেমন ওযু করেছেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)। এরপর একসঙ্গে নামায পড়লেন এবং বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসূল। (আল ইসাবাহ, হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী, ৪/২৭৪)

তিনি ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর প্রথম সহধর্মিণী। রাসূল (সাঃ) তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং অন্য বিবিগণের ওপর তার প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। রাসল (সাঃ) তাঁর পূর্বে এবং তাঁর জীবদ্দশায় দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর একাধিক সন্তানের জননী, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সর্বোত্তম জীবনসঙ্গিনী। উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদীজা (রাঃ) এর জীবদ্দশায় কাউকে বিয়ে করেননি। (সহীহ, মুসলিম, হাদিস নং ২৪৩৬)

তিনিই প্রথম নারী যার থেকে রাসূল (সাঃ) এর সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। রাসূল (সাঃ) ৫ জন সন্তান খাদিজা (রাঃ) থেকে জন্মগ্রহণ করেন। ৫ জন সন্তানের মধ্যে ৪ জন নবুওয়াতের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন আর একজন নবুওয়াতের পর জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত খাদীজা (রাঃ) পঁচিশ বছর প্রিয়নবী (সাঃ) এর সান্নিধ্যে কাটান। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে প্রত্যুষে দুই রাকাত আর রাতে দুই রাকাত নামায পড়তেন। এটা মিরাজের রাতে পাঁচওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার আগের ঘটনা। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-
الْحَضَرِ صَلَاةُ وَأُتِمَّتْ السَّفَرِ، صَلَاةُ فَأُقِرَّتْ رَكْعَتَيْنِ فُرِضَتْ مَا أَوَّلُ الصَّلَاةُ

প্রথম অবস্থায় নামায দু-রাকাআত করে ফরয করা হয় অতঃপর সফরে নামায সেভাবেই স্থায়ী থাকে এবং মুকীম অবস্থায় নামায পূর্ণ (চার রাকাআত) করা হয়েছে। (সহীহ, বুখারী, ১০৯০; সহীহ, মুসলিম, ৬৮৫)

হযরত খাদীজা (রাঃ) ফরয নামাযের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে ইন্তেকাল করেছিলেন। হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে খাদীজা (রাঃ) এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো যে, তিনি তো ফারাইয ও আহকাম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন! জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আমি তাকে জান্নাতের ঝর্ণামালা থেকে একটি ঝর্ণার পাশে এমন ঘরে দেখেছি, যেখানে কোনো কোলাহল নেই, নেই কোনো শোরগোল।

খাদিজা (রাঃ) সেই নারী, যাকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সালাম পাঠিয়েছেন। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদিন জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে এলেন। পাশে বসা ছিলেন খাদীজা (রাঃ)। জিবরাঈল বললেন, আল্লাহ তাআলা খাদীজাকে সালাম পৌঁছিয়েছেন। এ কথা শুনে হযরত খাদীজা (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলাই তো শান্তিদাতা। জিবরীলের প্রতি সালাম এবং আপনার ওপরও আল্লাহর সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। (সুনান, নাসায়ী, হাদিস নং ২৫৪; এর সনদ হাসান)

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট হাজির হয়ে বললেন-

عَلَيْهَا فَأَقْرَأُ أَتَتْكَ هِيَ فَإِذَا شَرَابٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ إِدَامٌ فِيهِ إِنَاءٌ مَعَهَا أَتَتْ قَدْ خَدِيجَةُ هَذِهِ اللَّهِ رَسُولَ يَا نَصَبَ وَلَا فِيهِ صَخَبَ لَا قَصَبٍ مِنْ الْجَنَّةِ فِي بِبَيْتٍ وَبَشِّرْهَا وَمِنِي رَبِّهَا مِنْ السَّلَامَ

“হে আল্লাহর রাসূল, ওই যে খাদীজা (রাঃ) একটি পাত্র হাতে নিয়ে আসছেন। ওই পাত্রে তরকারি, অথবা খাদ্যদ্রব্য অথবা পানীয় ছিল। যখন তিনি পৌঁছে যাবেন তখন তাকে তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এবং আমার পক্ষ থেকেও সালাম জানাবেন আর তাকে জান্নাতের এমন একটি ভবনের খোশ খবর দিবেন-যার অভ্যন্তর ভাগ ফাঁকা-মোতি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে থাকবে না কোনো প্রকার শোরগোল; কোনো প্রকার দুঃখ-ক্লেশ। (মুত্তাফাকুন আলাইহি; সহীহ, বুখারী, হাদিস নং ৩৮২০; সহীহ, মুসলিম, হাদিস নং ২৪৩২।)

মক্কায় প্রথম খাদিজা (রাঃ) কেই রাসূল (সাঃ) দাফন করার জন্য কবরে নামেন। মুসলমানরা শিয়াব থেকে ফিরে আসার পর একই বছরে হযরত খাদিজা (রাঃ) ও রাসূল (সাঃ) এর প্রিয় চাচা আবু তালিব মারা যান। এজন্য এ বছরকে শোকের বছর বলা হয়।

খাদীজা (রাঃ) এর প্রশংসা রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,
وَخَدِيجَةُ عِمْرَانَ بِنْتُ وَمَرْيَمُ فِرْعَوْنَ امْرَأَةُ آسِيَةُ إِلَّا النِّسَاءِ مِنَ يَكْمُلْ وَلَمْ كَثِيرٌ الرِّجَالِ مِنْ كَمَلَ الطَّعَامِ سَائِرِ عَلَى الثَّرِيدِ كَفَضْلِ النِّسَاءِ عَلَى عَائِشَةَ فَضْلَ وَإِنَّ خُوَيْلِدٍ بِنْتُ
"পুরুষের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতা অর্জন করেছেন; কিন্তু মহিলাদের মধ্যে ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়া, ইমরানের কন্যা মারইয়াম এবং খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ ব্যতীত আর কেউ পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়নি। তবে 'আয়েশার মর্যাদা সব মহিলার ওপর এমন, যেমন সারীদের (গোশতের সুরুয়ায় ভিজা রুটির) মর্যাদা সকল প্রকার খাদ্যের উপর।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি। সহীহ, বুখারী, হাদিস নং ৩৪১১; সহীহ, মুসলিম, হাদিস নং ২৪৩৩)

আলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, সমগ্র নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারইয়াম হলেন সর্বোত্তম আর নারীদের সেরা হলেন খাদীজা (রাঃ)। (মুত্তাফাকুন আলাইহি। সহীহ, বুখারী, হাদিস নং ৩৪৩২; সহীহ, মুসলিম, হাদিস নং ২৪৩০)

আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে এসেছে-
'জান্নাতের অধিকারী নারীদের মধ্যে খাদীজা, ফাতিমা, মারইয়াম ও আসিয়া সর্বোত্তম।' (মুসনাদ, আহমাদ, ১/২৯৩; তাবারানী, হাদিস নং ১১৯২৮; এর সনদ সহীহ)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন-
"সারা বিশ্বের নারীদের মধ্যে মারইয়াম বিনতে ইমরান, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ এবং ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া তোমার জন্য যথেষ্ট।" (সুনান, আত-তিরমিযী: হাদিস নং ৩৮৭৮, মুসনাদ, আহমাদ: ৩/১৩৫, হাকিম: ৩/১৫৭: এয় সনদ সহীহ)

হযরত আয়েশা বিনতে আবি বকর (রাঃ)

হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর সর্বকনিষ্ঠ স্ত্রী। তাঁর উপাধি ছিল 'সিদ্দিকা' (সত্যবাদী) এবং 'হুমায়রা' (লালচে)। তিনি অত্যাধিক সুন্দর হওয়ায় তাকে হুমায়রা বলা হতো।

জ্ঞান সাধনা ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদা আয়েশা (রা:) কে নারী শিক্ষার অগ্রদূত বলা যায়। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা হয়েছে নবুয়তের মাদ্রাসায়। শৈশব কেটেছে ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর অভিভাবকত্বে ও যৌবন কেটেছে মানব সভ্যতার সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষক, নবি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর তত্ত্বাবধানে। ইমাম যুহরী (রহ.) বলেন-
'উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদা আয়েশা (রাঃ) ও সব মহিলার ইলম একত্র করা হয়, উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদা আয়েশা রা. -এর ইলমই সর্বাধিক হবে।' (মহিয়শী নারীদের আলোকিত জীবন, পৃষ্ঠা ৮৭)

আয়েশা (রাঃ) এর সাথে নবি (সাঃ) বিয়ে হওয়ার আগেই নবি (সাঃ) তাঁকে স্বপ্নে দেখেন। আসমান থেকে ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদা আয়েশা (রাঃ) এর বিয়ে হয়েছিল। রাসূল (সাঃ) তাকে তিনবার স্বপ্নে দেখেছিলেন। জিবরাঈল (আঃ) তার ছবি নিয়ে এসে বলতেন, এ তোমার সঙ্গী হবে, দুনিয়া ও আখিরাতে। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) তাকে বলেন-

أَنْتِ هِيَ فَإِذَا فَأَكْشِفُ امْرَأَتُكَ هَذِهِ وَيَقُوْلُ حَرِيْرٍ مِنْ سَرَقَةٍ فِي أَنَّكِ أَرَى مَرَّتَيْنِ الْمَنَامِ فِي أُرِيتُكِ يُمْضِهِ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ هَذَا يَكُ إِنْ فَأَقُولُ

"দু-বার তোমাকে আমায় স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। আমি দেখলাম, তুমি একটি রেশমী কাপড়ে আবৃতা এবং আমাকে বলছে ইনি আপনার স্ত্রী, আমি তার ঘোমটা সরিয়ে দেখলাম, সে তুমিই। তখন আমি ভাবছিলাম, যদি তা আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে, তবে তিনি তা বাস্তবায়িত করবেন।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি; সহীহ, বুখারী, ৩৮৯৫; সহীহ, মুসলিম, ২৪৩৮; মুসনাদ, আহমাদ, ৬/৪১, ১২৮ ও ১৬১)

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, জিবরাঈল (আঃ) একখানা সবুজ রংয়ের রেশমী কাপড়ে তার (আয়েশার) প্রতিচ্ছবি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে নিয়ে এসে বললেন, ইনি দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার স্ত্রী। (সুনান, আত-তিরমিযী: হাদিস নং ৩৮৮০; আরনাউত রিজালগণকে সিকা বলেছেন)

রাসূল (সাঃ) এর সাথে তার সাত বছর বয়সে বিয়ে হয় ও নয় বছর বয়সে তিমি স্বামী গৃহে গমন করেন। তিনি ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী। তিনি ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী। তিনি জিবরাঈল (সাঃ) কে দুবার স্বচোক্ষে দেখেছেন। তার প্রতি জিবরাঈল (আঃ) সালাম পাঠিয়েছেন। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন-

تُرِيدُ أَرَى لَا مَا تَرَى وَبَرَكَاتُهُ اللهِ وَرَحْمَةُ السَّلَامُ وَعَلَيْهِ فَقُلْتُ السَّلَامَ يُقْرِئُكِ جِبْرِيلُ هَذَا عَائِشَةَ يَا وسلم عليه الله صلى اللهِ رَسُولَ

আয়েশা, জিবরাঈল (আঃ) তোমাকে সালাম বলেছেন। আমি উত্তরে বললাম, ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনি যা দেখতে পান আমি তা দেখতে পাই না। এ কথা দ্বারা তিনি রাসূল (সাঃ) কে বুঝিয়েছেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি; সহীহ, বুখারী, হাদিস নং ৩৭৬৮; সহীহ, মুসলিম, হাদিস নং ৮০, ২৪৪৭; সুনান, আত-তিরমিযী, হাদিস নং ৩৩৮৮১)

রাসূল (সাঃ) যখন আয়েশা (রাঃ) এর বিছানায় থাকতেন তখনো ওহি নাযিল হতো। একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন-

عَائِشَةَ إِلَّا امْرَأَةٍ ثَوْبِ فِي وَأَنَا يَأْتِنِي لَمْ الْوَحْيَ فَإِنَّ عَائِشَةَ فِي تُؤْذِينِي لَا

"(আমার কাছে অনিচ্ছাকৃত ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে জানতে চেয়ে) আয়েশা সম্পর্কে কষ্ট দিয়ো না। কারণ, নিঃসন্দেহে আমার ওপর আয়েশার বিছানা ছাড়া অন্য কারও বিছানায় ওহী অবতীর্ণ হয়নি।" (সহীহ, বুখারী, ২৩৯৩, সহীহ, মুসলিম, ৪৪৭১, সুনান, তিরমিজী, ৩৮১৪)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাঃ) এর ছিল সুউচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থান। তার মান-মর্যাদার বর্ণনা দিতে গিয়ে ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে ছাড়া আর আর কোনো কুমারী নারী বিয়ে করেননি এবং তার মতো আর কাউকে ভালোবাসেননি। এটা আমরা দেখতে পাই হযরত হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) এর ঘটনা থেকে। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, মানুষের মধ্যে কে আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বললেন, আয়েশা। আমর (রাঃ) বললেন, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, তার পিতা।

এক সফরে চলার পথে আয়েশা (রাঃ) এর উটনীটি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে তাকে নিয়ে দৌড় দেয়। এতে রাসূলে কারীম (সাঃ) এতই অস্থির হয়ে পড়েন যে, তার মুখ দিয়ে তখন উচ্চারিত হতে শোনা যায়, 'ওয়া আরূসাহ!' হায়! আমার বধূ! (মুসনাদ, আহমাদ, ৬/২৩৮)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন-

الطَّعَامِ سَائِرِ عَلَى الثَّرِيدِ كَفَضْلِ النِّسَاءِ عَلَى عَائِشَةَ فَضْلُ

"আয়েশার মর্যাদা সব মহিলাদের ওপর এমন, যেমন সারিদ এর মর্যাদা সব খাদ্যদ্রব্যের ওপর। (সহীহ, বুখারী, ২১৭৯, সহীহ, মুসলিম, ৪৪৫৯, সুনান, তিরমিজী, ১৭৫৭)

একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ফাতিমা (রাঃ) কে উদ্দেশ্য করে বললেন-
لِعَائِشَةَ هَذِهِ فَاحْبِنِي فَقَالَ بَلَى فَقَالَتْ أُحِبُّ مَا تُحِبِينَ السَتِ بَنِيهِ أَيْ

"হে প্রিয় কন্যা, তুমি কি তাকে ভালোবাসবে না, যাকে আমি ভালোবাসি? হযরত ফাতিমা (রাঃ) বললেন, কেন নয়? (অর্থাৎ, আমিও তাকে অবশ্যই ভালোবাসবো যাকে আপনি ভালোবাসেন)। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তাহলে তুমি আয়েশাকে ভালোবেসো।" (সহীহ, বুখারী, ২৩৯৩; সহীহ, মুসলিম, ৪৪৭২, সুনান, নাসায়ী, ৩৮৮৩)

ইফকের ঘটনার পর আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রটনা করা হলে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে আয়েশা (রাঃ) এর নির্দোষিতা ও নিষ্কলুষতা সংক্রান্ত পূর্ণ ১০ আয়াত নাজিল করেন। এছাড়াও এক সফরে আয়েশা (রাঃ) এর হার হারিয়ে গেলে তা খোঁজার জন্য সবাই থেমে যায় আর সে স্থানের নিকটে কোনো পানি ছিল না আল্লাহ তা'আলা তখন তায়াম্মুমের আয়াত নাজিল করেন।

রাসূল (সাঃ) আয়েশা (রাঃ) এর কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মুখের লালার সাথে রাসূল (সাঃ) এর মুখের লালা মিলেছে, ও তাঁর ঘরেই রাসূল (সাঃ) কে কবর দেওয়া হয়েছে। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-
"যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়তেন তখন তিনি আশ্রয় প্রার্থনার দুই সূরাহ (ফালাক ও নাস) পাঠ করে নিজ দেহে ফুঁক দিতেন এবং স্বীয় হাত দ্বারা শরীর মাসাহ করতেন। এরপর যখন মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন আমি আশ্রয় প্রার্থনার সূরাহ দুটি দিয়ে তার শরীরে ফুঁ দিতাম, যা দিয়ে তিনি ফুঁ দিতেন। আর আমি তাঁর হাত দ্বারা তার শরীর মাসাহ করিয়ে দিতাম।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি; সহীহ, বুখারী, হাদিস নং ৪৪৩৯; সহীহ, মুসলিম, হাদিস নং ২১৯২)

আয়েশা (রাঃ) বলতেন- "রাসূল (সাঃ) আমার ঘরে আমার বারির দিনে এবং আমারই বুকে ইন্তেকাল করেন। জীবনের একেবারে অন্তিম মুহর্তে আবদুর রহমান ইবনে আবি বকর (রাঃ) একটি কাঁচা মিসওয়াক হাতে করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে দেখতে আসেন। রাসূল (সাঃ) সেই মিসওয়াকটির দিকে বার বার তাকাতে লাগলেন। বুঝলাম, তিনি সেটা চাচ্ছেন। আমি সেটা নিয়ে ধুয়ে নিজে চিবিয়ে নরম করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে দিলাম। তিনি সেটা দিয়ে সুন্দর করে মিসওয়াক করলেন। তারপর আমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য হাত বাড়ালেন, কিন্তু হাতটি

পড়ে গেল। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সেই মহান আল্লাহর প্রশংসা যিনি তার রাসূলের পার্থিব জীবনের শেষ মুহূর্তটিতে তার ও আমার থুতু মিলিত করেছেন।" (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১/১৮৯)

আয়েশা (রাঃ) শরীয়াতের এক চতুর্থাংশ জ্ঞান বহন করেছেন। মহান আল্লাহ তাআলা উম্ম,হাতুল মুমিনীনদের উদ্দেশ্য করে বলছেন-

لَطِيفًاخَبِيرًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ وَالْحِكْمَةِ اللَّهِ آيَتِ مِنْ بُيُوتِكُنَّ فِي يُتْلَى مَا وَاذْكُرْنَ

"আর তোমাদের ঘরে আল্লাহর যে, আয়াতসমূহ ও হিকমত পঠিত হয়-তা তোমরা স্মরণ রেখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।" (সূরা আল-আহযাব, আয়াতঃ ৩৪)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এত বেশি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেগমগণ তথা সকল মহিলা সাহাবীদের শুধু নন হাতে গোনা চার-পাঁচজন পুরুষ সাহাবী ছাড়া আর কেউই তার সমকক্ষতা দাবি করতে পারেন না। মাহমুদ ইবনে লাবীদ মন্তব্য করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বেগমগণ বহু হাদিস স্মৃতিতে ধরে রেখেছিলেন: কিন্তু কেউ আয়েশা (রাঃ) ও উম্মে সালামা (রাঃ) এর সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেননি।

তাবেয়ীদের ইমাম বলে খ্যাত হযরত ইমাম যুহরী-যিনি একাধিক অতি মর্যাদাবান সাহাবীর তত্ত্বাবধানের লালিত-পালিত হন। তিনি বলেন- "হযরত আয়েশা (রাঃ) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অনেক বড় বড় সাহাবী তার কাছে জানতে চাইতেন।" (মুসতাদরাকে হাকিম, ৪/১১)

প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত আতা ইবনে আব রাবাহ-যিনি বহু সাহাবীর ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, বলেন, "হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন মানুষর মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ, সবচেয়ে বেশি জানা ব্যক্তি এবং আম জনতার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর মতামতের অধিকারিণী।" (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২/১৮৫)

উরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন- "আমি হালাল-হারাম, জ্ঞান, কবিতা ও চিকিৎসা বিদ্যায় উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) অপেক্ষা অধিকতার পারদর্শী অন্য কাউকে দেখিনি।" (তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ৭/৩৯-৫৬)

হযরত ফাতিমা (রাঃ)
জান্নাতী নারীদের সর্দার

হযরত ফাতিমা (রাঃ) রাসূল এর নবুওয়াত লাভের ৫ বছের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কনিষ্ঠা মেয়ে। তিনি ছিলেন তিক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। একবার যে কথা শুনতেন তাই মনে রাখতে পারতেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে সবচেয়ে বেশি স্নেহের ও প্রিয় পাত্রী ছিলেন ফাতিমা (রাঃ)। একবার রাসূল (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার সবচেয়ে বেশি প্রিয় মানুষটি কে? বললেন, ফাতিমা। (আস সিয়ার, ২/১৩৩)

ফাতিমা (রাঃ) এর মহত্ত্ব, মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য অনেক। নবী পরিবারের মধ্যে আরও মর্যাদাবান ব্যক্তি আছেন কিন্তু তাদের মাঝে হযরত ফাতিমার (রাঃ) অবস্থান এক বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থানে। সূরা আল-আহযাবের আয়াতে তাতহীর (পবিত্রকরণের আয়াত) এর নুযূল হযরত ফাতিমা (রাঃ) এর বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করেন।

تَطْهِيرًا وَيُطَهِّرَكُمْ الْبَيْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إِنَّمَا

“হে নবী-পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।” (সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৩)

ইমাম আহমাদ (রাঃ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবি (সাঃ) 'আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইনের (রাঃ) দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে যে যুদ্ধ করে আমি তাদের জন্য যুদ্ধ, তোমাদের সাথে যে শান্তি ও সন্ধি স্থাপন করে আমি তাদের জন্য শান্তি। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/১২৩)

হযরত রাসূলে কারীম (সাঃ) একদিন ফাতিমা (রাঃ) কে বলেন- ‘আল্লাহ তাআলা তোমার খুশিতে খুশি হন এবং তোমার অসন্তুষ্টিতে অসন্তুষ্ট হন।’ (তাহযীবুত তাহযীব, ১২/৪৪২; আল ইসাবাহ, ৪/৩৬৬)

বুখারী শরীফে আছে, একবার আবু জাহলের ভাই হযরত আলী (রাঃ) কে গাওরা বিনতে আবু জাহেলকে বিবাহের প্রস্তাব দিল। তিনি কিছুটা সম্মত হলেন। সুতরাং গাওরা এর অভিভাবকরা রাসূল (সাঃ) এর কাছে অনুমতি নেওয়ার জন্য আসল। রাসূল (সাঃ) এ বিষয়টি খুব অপছন্দ

করলেন। তিনি মসজিদে গেলেন, মিম্বারে উঠে বললেন, বনু হিশাম ইবনে মুগীরা আলী ইবনে আবি তালিবের সঙ্গে তাদের মেয়ে বিবাহ দিতে চায়, আমার কাছে এসেছে অনুমতি নেওয়ার জন্য। আমি কখনো অনুমতি দিবো না। কখনো দেব না। তবে আলী আমার মেয়েকে তালাক দিয়ে তাকে বিবাহ করতে পারে। ফাতিমা আমার শরীরের অংশ। যে তাকে কষ্ট দিবে, সে আমাকে কষ্ট দিবে।

একবার হযরত ফাতিমা (রাঃ) অসুস্থ হলে রাসূল (সাঃ) তাকে দেখতে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছ, মেয়ে?' ফাতিমা রা. কিছু অভাব-অনটনের অভিযোগ করলে তিনি বললেন, 'মেয়ে! তুমি বিশ্বের সকল নারীর নেত্রী হও এতে কি সন্তুষ্ট নও?' ফাতিমা রা. বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, তাহলে মারইয়াম বিনতে ইমরানের অবস্থান কোথায়?' জবাবে রাসূল (সাঃ) বললেন, 'তিনি ছিলেন তার সময়ের নারীদের নেত্রী, আর তুমি হবে তোমার সময়ের নারীদের নেত্রী। আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের একজন নেতার সাথে বিয়ে দিয়েছি।' হযরত রাসূলে কারীম (সাঃ) তাকে বলেছেন, 'জান্নাতের অধিবাসী নারীদের নেত্রী হলেন ক্রমানুসারে মারইয়াম, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খাদীজা ও ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া। (মুসনাদ, আহমাদ: ১/২৯৩; মুসতাদরাকে হাকিম, ২/৫৯৪)

একবার রাসূল (সাঃ) মাটিতে চারটি রেখা টানলেন, তারপর বললেন, তোমরা কি জান এটা কি? সবাই বলল, আল্লাহর ও তাঁর রাসূলই (সাঃ) ভালো জানেন। তিনি বললেন, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, মারইয়াম বিনতে 'ইমরান ও আসিয়া বিনতে মুযাহিম (ফিরআউনের স্ত্রী) -জান্নাতের নারীদের ওপর তাদের রয়েছে এক বিশেষ মর্যাদা।

হযরত ফাতিমা (রাঃ) ব্যক্তিত্বের প্রতি যে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়েছে তা রাসূলের (সাঃ) এর এই হাদীসে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে- ‘পৃথিবীর নারীদের মধ্যে তোমার অনুসরণের জন্য মারইয়াম, খাদীজা, ফাতিমা ও ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া যথেষ্ট।’ (সুনান, আত-তিরমিযী, ৩৮৭৮; মুসতাদরাকে হাকিম, ৩/১৫৫)

রাসূল (সাঃ) এর কন্যা জান্নাতীদের সর্দার ফাতিমা (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এর ইন্তেকালের ছয় মাস পরেই মারা যান। আর রাসূল (সাঃ) মারা যাওয়ার পর নবি পরিবারের মধ্যে তিনিই প্রথম মারা যান, যা রাসূল (সাঃ) তাঁর মৃত্যের পূর্বেই ফাতিমা (রাঃ) জানিয়ে ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন-

“যখন إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ এই সূরা নাযিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফাতিমা (রাঃ) কে ডেকে বললেন: 'আমাকে আমার মৃত্যুর (নিকটবর্তীতার) কথা জানানো হয়েছে।' এ কথা শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন, 'কেঁদো না, আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে আগে মিলিত হবে।' একথা শুনে তিনি হাসতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কয়েকজন স্ত্রী এ ঘটনা দেখে বললেন, 'হে ফাতিমা, একবার তোমাকে আমরা কাঁদতে দেখলাম, এরপরই আবার হাসতে দেখলাম (ব্যাপারটা কী?' তখন ফাতিমা (রাঃ) বললেন, 'তিনি আমাকে বললেন যে, তাঁকে তাঁর মৃত্যুর (নিকটবর্তীতার) খবর জানানো হয়েছে, তা শুনে আমি কাঁদতে লাগলাম। এরপর তিনি আমাকে বললেন, 'কেঁদো না; কেননা, তুমিই সর্বপ্রথম আমার পরিবারের মধ্য হতে আমার সাথে মিলিত হবে।' তখন আমি হাসলাম।” (সুনান, আদ-দারেমী, হাদিস নং ৮০; হায়াতুস সাহাবা, ২/৪৩০)।

ফাতিমা বিনতে আসাদ (রাঃ)
যার কবরে বিছানো হয়েছিল রাসূল (সাঃ) এর পবিত্র জামা

ইসলামের প্রথম যুগে যে সকল মহীয়সী মহিলার অবদান স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে, তাদের মধ্যে হযরত ফাতিমা বিনতে আসাদ (রাঃ) একজন। ইসলামের একেবারে সূচনা পর্বে যে ক'জন মুষ্টিমেয় মহিলা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনে মুসলমান হন তাদের মধ্যে ফাতিমা বিনতে আসাদ অন্যতম। ইসলামের প্রথম হিজরতকারী দলের সদস্যা। রাসূল (সাঃ) এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুর পূর্বে রাসূল (সাঃ) এর পালন-পালনের দায়িত্ব ভার আবু তালিব ও তার স্ত্রী ফাতিমা বিনতে আসাদ (রাঃ) কে অর্পণ করেন। ফাতিমা (রাঃ) তার স্বামীর সাথে একযোগে মুহাম্মদ (সাঃ) এর তত্ত্বাবধান ও প্রতিপালনে মনোযোগী হন। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত, তথা হযরত খাদীজার (রাঃ) এর সাথে বিয়ের আগ পর্যন্ত নিজের সন্তানের থেকেও অধিক স্নেহ-মমতা দিয়ে লালন-পালন করেন। সব রকমের অশুভ ও অকল্যাণ থেকে আঁচলে লুকিয়ে রাখার মতো তাকে আগলে রাখেন। এ কারণে নবি (সাঃ) সারা জীবন চাচী ফাতিমা বিনতে আসাদ (রাঃ) এর মধ্যে নিজের মা আমিনা বিনতে ওহাবের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেতেন। তাকে গর্ভধারিণী মায়ের পরে দ্বিতীয় মা বলে মনে করতেন।

রাসূল্লাহ (সাঃ) এর নিকট ফাতিমা বিনতে আসাদের (রাঃ) মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে ইবনে সাআদ বলেন-

‘ফাতিমা বিনতে আসাদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি একজন সৎকর্মশীল মহিলা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে দেখতে যেতেন এবং তার গৃহে দুপুরে বিশ্রাম নিতেন।” (তাবাকাতে ইবনে সাআন, ৮/২২২: সিফাতুল সাফওয়া, ২/৫৪; আল ইসাবাহ, ৪/৩৮০)

ফাতিমা বিনতে আসাদ (রাঃ) এর প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অতিরিক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকার কারণে তিনি মাঝে মাঝে তাকে বিভিন্ন জিনিস উপহার-উপঢৌকন পাঠাতেন। জাদা ইবনে হুবায়রা আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট এক জোড়া অতি উন্নতমানের নতুন কাপড় পাঠালেন। সাথে সাথে এ কথাও বলে পাঠালেন যে, 'এ দু-টোকে নিকাবের কাপড় বানিয়ে ফাতিমাদের মধ্যে ভাগ করে দাও।' আমি চার টুকরো করলাম। এক টুকরো দিলাম ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহকে, এক টুকরো ফাতিমা বিনতে আসাদকে এবং আর এক টুকরো ফাতিমা বিনতে হামযা (রাঃ) কে। তবে তিনি চতুর্থ টুকরোটি যে কাকে দেন তা বলেননি। (আল ইসাবাহ, ৪/৩৭০; উসদুল গাবাহ, ভাষ্য নং ৭১৭২)

সাহাবায়ে কেরামের অন্তরেও ফাতিমা বিনতে আসাদ (রাঃ) এর একটা মর্যাদাপূর্ণ আসন ছিল। জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ) মুতায় শহীদ হওয়ার পর কবি হাসসান ইবনে সাবিত (রাঃ) তার স্মরণে যে কবিতাটি রচনা করেন তাতে তার মা ফাতিমারও ভূয়সী প্রশংসা করেন। তেমনিভাবে কবি হাজ্জাজ ইবনে আলাত সুলামীও উহুদ যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) এর বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রশংসা করতে গিয়ে তার মায়েরও প্রশংসা করেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/৩৪৯)

হযরত ফাতিমা বিনতে আসাদ (রাঃ) এর মৃত্যু রাসূল (সাঃ) এবং সাহাবীদের মনে দারুণ বেদনার ছাপ ফেলে। রাসূল (সাঃ) তার জন্য দুআ করেন, তার প্রশংসা করেন এবং নিজের জামা দিয়ে তার কাফন দেন। হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে বসে ছিলাম। এমন একজন এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আলী, জাফর ও আকীলের মা মারা গেছেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তোমরা সবাই আমার মার কাছে চলো। আমরা উঠলাম এবং এমন নিঃশব্দে পথ চললাম যেন আমাদের প্রত্যেকের মাথার ওপর পাখি বসে আছে। বাড়ির দরজায় পৌছার পর রাসূল (সাঃ) গায়ের জামাটি খুলে পরিবারের লোকদের হাতে দিয়ে বলেন, তার গোসল দেওয়া শেষ হলে এটি তার কাফনের নীচে দিয়ে দেবে।

যখন লোকেরা দাফনের জন্য লাশ নিয়ে বের হলো তখন রাসূল (সাঃ) একবার খাটিয়ায় কাঁধ দেন, একবার খাটিয়ার সামনে যান, আরেকবার পেছনে আসেন। এভাবে তিনি কবর পর্যন্ত পৌঁছেন। তারপর কবরে নেমে গড়াগড়ি দিয়ে আবার উপরে উঠে আসেন। তারপর বলেন, আল্লাহর নামের সাথে এবং আল্লাহর নামের ওপরে তোমরা তাকে কবরে নামাও। দাফন কাজ শেষ হওয়ার পর তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, আমার মা ও প্রতিপালনকারিণী! আল্লাহ আপনাকে ভালো প্রতিদান দিন। আপনি ছিলেন আমার একজন চমৎকার মা ও চমৎকার প্রতিপালনকারিণী। জাবির (রাঃ) বলেন, আমরা বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি এখানে এমন দু-টি কাজ করেছেন, আমরা কখনো আপনাকে এ ধরনের কাজ করতে দেখি না।' বললেন, 'সে দুটি কাজ কী?' বললাম, 'আপনার জামা খুলে দেওয়া এবং কবরে গড়াগড়ি দেওয়া।' বললেন, 'জামাটির ব্যাপার হলো, আমি চেয়েছি তাকে যেন কখনো জাহান্নামের আগুন স্পর্শ না করে। যদি আল্লাহ চান। আর কবরে আমার গড়াগড়ি দেওয়া-আমি চেয়েছি আল্লাহ যেন তার কবরটি প্রশস্ত করে দেন। (কানযুল উম্মাল, ১৩/৬৩৬, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/১১৮)

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, ফাতিমা বিনতে আসাদ (রাঃ) নিশ্চিতভাবেই জান্নাতে যাবেন। ইমাম কুরতুবী বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা তার নবি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, কবরে তার ওপর দলন-পেষণ চালানো হবে না। যেহেতু তিনি ফাতিমা বিনতে আসাদ (রাঃ) এর কবরে শুয়েছেন, এজন্য তাঁর বরকতে ফাতিমা বিনতে আসাদ (রাঃ) কবরের পেষণ থেকে মুক্তি পেয়ে গিয়েছেন।'

উম্মে উমারা (রাঃ)
রাসূলকে বাঁচাতে যে নারী উহুদে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন

উম্মে উমারা (রাঃ) এর আসল নাম নুসাইবা বিনতে কাআব (রাঃ)। তিনি আকাবার দ্বিতীয় বাইআতে অংশগ্রহণ করেন। এই বিশিষ্ট সাহাবিয়ার গুণাবলী সম্পর্কে আবু নুয়াইম বলেন, 'উম্মে উমারা (রাঃ) আকাবায় বাইআত গ্রহণকারী, পুরুষদের সাথে যুদ্ধকারী। তিনি ছিলেন যথেষ্ট ত্যাগী বীর সাহাবিয়া: রোযাদার, কঠিন ত্যাগ ও দৃঢ় বিশ্বাসের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত।

তাঁর সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহ:) বলেন- 'উম্মে উমারা (রাঃ) এর আসল নাম নুসাইবা। পিতার নাম কাআব ইবনে আমর। মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের নাজ্জার শাখার কন্যা। বিখ্যাত বদরী সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কাব আল মাযিনীর বোন। উম্মে উমারা (রাঃ)

উহুদ, হুদাইবিয়া, খায়বার, কাযা উমরা আদায়, হুনাইন ও ইয়ামামার যুদ্ধ ও অভিযানে যোগ দেন। তার সম্পর্কে বহু হাদিস বর্ণিত আছে। জিহাদে তার হাত কেটে যায়। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২/২৭৮)

তিনি ছিলেন নারী জাতির নেত্রী। তিনি ছিলেন মহিলা বীর যোদ্ধা। উম্মে উমারা (রাঃ) তাঁর স্বামী ও দুই ছেলে সহ উহুদ যুদ্ধে ঢোগদান করেন। তিনি যোদ্ধাদের পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে গেলেও তিনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ১২-১৩ টি আঘাতে তার দেহ জর্জরিত হয়। তিনিও তীর-বর্শা দ্বারা ১২ জন পৌত্তলিক সৈন্যকে আহত করেন।

উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর যখন নাজুক অবস্থা তখন যে কয়েকজন রাসূল (সাঃ) নিরাপত্তা বিধান করেন উম্মে উমারা (রাঃ) তাদের একজন। এক কাফিরের নিক্ষিপ্ত একটি আঘাতে হযরত রাসূলে পাক (সাঃ) একটি দাঁত ভেঙে যায়। পাষণ্ড ইবনে কামিআ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে তাক করে তরবারির একটি কোপ মারে, কিন্তু তা ফসকে যায়। মুহূর্তে উমারা (রাঃ) ফিরে দাঁড়ান। তিনি নরপশু ইবনে কামিআর ওপর ঝাপিয়ে পড়েন, তবে তার সারা দেহে বর্ম থাকায় তার কিছু হলো না। তবে সে উম্মে উমারা (রাঃ) কে তাক করে এবার একটি কোপ মারে এবং এই উম্মে উমারা (রাঃ) এর কাঁধে লাগে। এতে তিনি মারাত্মক আহত হন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২/৮১-৮২)

ইবন কামিআ তো ভেগে প্রাণ বাঁচাল: কিন্তু উম্মে উমারার আঘাতটি ছিল অতি মারাত্মক। তার সারা দেহ রক্তে ভিজে গেল। সেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তার ক্ষত স্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধান।

উম্মে উমারা (রাঃ) বাইআতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণ করেন। এবং মৃত্যুর ওপর শপথ করছিলেন। যেই বাইআতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, 'বৃক্ষের নিচের বাইআতে যারা অংশগ্রহণ করেছে তারা কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না (সহীহ, মুসলিম; মুসনাদ, আহমাদ; সুনান, আবু দাউদ; সুনান, আত-তিরমিযী)
সুসংবাদের আলোয় উদ্ভাসিত এই ভাগ্যবানদের অন্যতম হযরত উম্মে উমারা (রাঃ) এর মর্যাদাও ছিল ঈর্ষণীয়।

তিনি উম্মে উমারা (রাঃ) হুনাইনের ও ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইয়ামামার যুদ্ধে তার একটি হাতও কেটে গেছিল।

খলীফা হযরত উমর (রাঃ) ও উম্মে উমারা (রাঃ) এর সম্মান ও মর্যাদার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তার খেলাফত কালে একবার গনীমতের মালের মধ্যে কিছু চাদর আসে। তার মধ্যে একটি চাদর ছিল খুবই সুন্দর ও দামী। অনেকে বললেন, এটি খলীফা তনয় আবদুল্লাহ (রাঃ) এর স্ত্রীকে দেওয়া হোক। অনেকে খলীফার স্ত্রী কুলসুম বিনতে আলী (রাঃ) কে দেওয়ার কথা বললেন। খলীফা কারও কথায় কান দিলেন না। তিনি বললেন, আমি এ চাদরের সবচেয়ে বেশি হকদার উম্মে উমারাকে মনে করি। এটি তাকেই দেব। কারণ, আমি উহুদের দিন তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বলতে শুনেছি, 'আমি যে দিকেই দৃষ্টিপাত করছিলাম, শুধু উম্মে উমারাকেই লড়তে দেখছিলাম।' অতপর তিনি চাদরটি তার কাছে পাঠিয়ে দেন।

সুমাইয়া বিনতে খুব্বাত (রাঃ)
ইসলামের প্রথম শহীদ

ইসলামের প্রথম শহীদ হযরত সুমাইয়া বিনতে খুব্বাত (রাঃ)। ইসলামের ইতিহাসে তার সম্মান ও মর্যাদা সুউচ্চ। এটা তো ধ্রুব সত্য যে, হযরত ইয়াসির এবং তার পরিবার জান্নাতের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী-

الْجَنَّةُ مَوْعِدَكُمُ فَإِنَّ ، يَاسِرٍ الَ صَبْرًا

“হে ইয়াসিরের পরিবার, ধৈর্য ধরো। নিশ্চয় তোমাদের ঠিকানা জান্নাত।”

হযরত সুমাইয়া (রাঃ) যখন বার্ধক্যে দূর্বল হয়ে পড়েছেন তখন মক্কায় ইসলামী দাওয়াতের সূচনা হয়। দাওয়াতের প্রথম ভাগেই তিনি, তাঁর স্বামী ইয়াসির ও ছেলে আম্মারসহ গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁদের ওপর নেমে আসে কুরাািচদের অমানুষিক নির্যাতন। এই অমানুষিক নির্যাতনেও সুমাইয়া অচল অটল ছিলেন।

ইমাম আহমাদ ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন- “প্রথম যারা ইসলামের ঘোষণা দান করেন, তারা হলেন সাতজন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ), আবু বকর, আম্মার, আম্মারের মা সুমাইয়া, সুহাইব, বিলাল ও মিকদাদ (রাঃ)। আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে তার চাচার দ্বারা এবং আবু বকরকে তার গোত্রের দ্বারা নিরাপত্তা বিধান

করেন। আর অন্যদেরকে মুশরিকরা লোহার বর্ম পরিয়ে প্রচণ্ড রোদে দাঁড় করিয়ে রাখত। (আল বিদায়া ওয়াননিহায়া, ৩/২৮; আল ইসাবাহ, ৪/৩৩৫)

ইয়াসির পরিবারকে কঠিন শাস্তি ও নির্যাতনে নিঃশেষ করে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় বনু মাখযূমের ওপর। এরা সকলে মিলে ওই পরিবার তথা হযরত ইয়াসির (রাঃ), হযরত সুমাইয়া (রাঃ) ও হযরত আম্মার (রাঃ) কে মক্কার উত্তপ্ত মরুভূমিতে নিয়ে যেত। সেখানে তাদের খুব নির্মমভাবে নির্যাতন করত।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন খবর পেতেন, অমুক স্থানে ইয়াসির পরিবারকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, তখন তিনি সেখানে যেতেন। এটা ওই সময়ের ঘটনা, যখন রাসূল (সাঃ) এর নিকট মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে আপতিত শাস্তি ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার মতো কোনো উপায়-উপকরণ ছিল না। এটা ছিল আল্লাহ তাআলারই অভিপ্রায়।

উসমান (রাঃ) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে বাতহা উপত্যকায় হাঁটছিলাম। তখন দেখতে পেলাম, আম্মারের পিতা রাসূল (সাঃ) কে দেখে বলে ওঠেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ, কালচক্র এ রকম? রাসূল (সাঃ) বললেন, হে ইয়াসিরের পরিবার-পরিজন! ধৈর্য ধরো। হে আল্লাহ, ইয়াসিরের পরিবারবর্গকে ক্ষমা করুন। (তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ৩/১৭৭; কানযুল উম্মাল, ৭/৭২)
হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) এবং তাদের পরিবারের বিভিন্ন কষ্ট-যন্ত্রণা ও নির্যাতনের কথা তার বন্ধুরা পরস্পর বলাবলি করতেন। আমর ইবনে হাকাম বলতেন, 'আম্মারকে এত ভয়ঙ্কর নির্যাতন করা হতো যে, সে বলতে পারত না সে কী বলছে।' আমর ইবনে মাইমূন বলতেন, 'একদিন মুশরিকরা আম্মারকে আগুনের অঙ্গারের ওপর শুইয়ে দিয়েছে। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি ব্যথিত চিত্তে আম্মারের মাথায় হাত রেখে বললেন-

إِبْرَاهِيمَ عَلَى سَلَمًا وَ بَرْدًا كُنْتَ كَمَا ، عَمَّارٍ عَلَى سَلَمًا وَ بَرْدًا كُونِي يُنَارُ

হে আগুন, ইব্রাহিমের মতো তুমি আম্মারের জন্য ঠাণ্ডা হয়ে যাও।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রতিদিন ইয়াসির পরিবারের সাহস ও ধৈর্যে উদ্দীপনা যোগাতে তাদের কাছে যেতেন। তাদেরকে যখন অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হতে দেখতেন। একদিন তিনি ওই খান্দানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) রাসূলুল্লাহ

(সাঃ) কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের অবর্ণনীয় নির্যাতন করা হচ্ছে।' রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ কথা শুনে বললেন-

الجَنَّة مَوْعِدَكُم فَإِنَّ ، يَاسِرٍ الَ صَبْرًا .. الْيَقْطَانِ أَبَا صَبْرًا

"আবুল ইয়াকযান, ধৈর্যধারণ করো। হে ইয়াসির পরিবার, ধৈর্যধারণ করো। তোমাদের ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত।" (তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ৩/১১৮)

সারাদিন এভাবে শাস্তি ভোগ করার পর সন্ধ্যায় তারা মুক্তি পেতেন। শাস্তি ভোগ করে হযরত সুমাইয়া (রাঃ) প্রতিদিনের মতো একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলেন। পাষণ্ড আবু জাহেল তাকে অশালীন ভাষায় গালি দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তার পশুত্বের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যায়। সে সুমাইয়া (রাঃ) এর দিকে বর্শা ছুড়ে মারে এবং সেটি তার শরীরে গিয়ে বিদ্ধ হয়। আর তাতেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫/৫৯)

হযরত সুমাইয়া (রাঃ) এর শাহাদাতের ঘটনাটি হিজরতের পূর্বের। এ কারণে তিনিই হলেন ইসলামের প্রথম শহীদ। হযরত মুজাহিদ (রহ.) বলেন, "ইসলামের প্রথম শহীদ হলেন আম্মারের মা সুমাইয়া।" (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/৫৯)

শহিদদের সর্দার হযরত সুমাইয়া (রাঃ) সেদিন যেভাবে অটল ছিলেন, এতে তিনি মানবতার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক কালজয়ী ও উপমারহিত ইতিহাসই সৃষ্টি করে গেছেন। সর্বকালের সর্বযুগের মুমিনদের হৃদয়ে তিনি এক মহাত্মা মা হিসেবে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

পবিত্র কুরআনে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামকে অনন্য মর্যাদা দান করেছেন। তাঁদের সম্পর্কে কুরআনে আয়াত নাজিল করেছেন। সাহাবীদের মর্যাদা বহন করে এমন কিছু আয়াত তুলে ধরা হলোঃ

আয়াত-১:

لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَيْرَ كُنْتُمْ

'তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, যাদেরকে মানুষের (কল্যাণ ও সংশোধনের) জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।' (সূরা আলি-ইমরান, আয়াতঃ ১১০)

আয়াত-২:

النَّاسِ عَلَى شُهَدَاءَ لِتَكُونُوا وَسَطًا أُمَّةً جَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ

'আমি তোমাদের বানিয়েছি এমন একটি দল যারা (সকল দিক বিবেচনায়) অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ নীতি, আর্দশ ও কর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেন তোমরা বিরোধী লোকদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হতে পারো।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াতঃ ১৪৩)

এ আয়াত দুটো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, নবি (সাঃ) এর পরে সকল মানুষের মাঝে সাহাবায়ে কেরামই সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, ন্যায়নিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য। আল্লামা সাফারীনী (রহ.) বলেন, আম্বিয়ায়ে কেরামের পরে সাহাবায়ে কেরামই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, এটাই জমহুর (সকল) উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। (المضية الدرة عقيدة شرح)

ইবরাহীম ইবনে সাঈদ জওহারী (রহ.) বলেন, আমি হযরত আবু উমামা (রহ.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, সাহাবী হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এবং তাবেঈ উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) এর মধ্যে কে উত্তম। তিনি জবাব দিলেন-
'আমরা মনে করি না যে, কোনো মানুষের পক্ষে সাহাবীদের সমকক্ষ হওয়া সম্ভব, উত্তম হওয়া তো দূরের কথা।'

আয়াত-৩:

مِنَ فَضْلًا يَبْتَغُونَ سُجَّدًا رُكَعًا تَرَاهُمْ بَيْنَهُمْ رُحَمَاءُ الْكُفَّارِ عَلَى أَشِدَّاءُ مَعَهُ وَالَّذِينَ اللهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ السُّجُودِ أَثَرِ مِنْ وُجُوهِهِمْ فِي سِيمَاهُمْ وَرِضْوَانًا اللَّهِ

'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও

সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন।' (সূরা আল-ফাতহ, আয়াতঃ ২৯)

আয়াত-৪:

وَرَضُوا عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِيَ بِإِحْسَانٍ اتَّبَعُوهُمْ وَالَّذِينَ وَالْأَنْصَارِ الْمُهَاجِرِينَ مِنَ الْأَوَّلُونَ وَالسَّابِقُونَ الْأَنْهَارُ تَحْتَهَا تَجْرِي جَنَّاتٍ لَهُمْ وَأَعَدَّ عَنْهُ

'আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত ঝরনাসমূহ।' (সূরা আত-তাওবা, আয়াতঃ ১০০)

আয়াত-৫:

وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

'কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের মুহাব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী, এটা আল্লাহর কৃপা ও নেয়ামত, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াতঃ ৭-৮)

হাদীসে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

হাদিস-১:

বুখারী, মুসলিমসহ অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) বলেন-

.ثَلَاثَةٌ أَوْ قَرْنَيْنِ ذَكَرَ ادري فَلَا نَهُمْ يَلُوْ الَّذِينَ ثُمَّ يَلُونَهُمْ الَّذِينَ ثُمَّ يَلُونَهُمْ الَّذِينَ ثُمَّ قَرْنِي لنَّاسِ خَيْرًا فِيهِمُ وَيَظْهَرُ يُؤْفُوْنَ وَلَا وَيُنْذِرُوْنَ تَمَنُوْنَ وَلَايُوْ وَيَخُونُوْنَ يُسْتَشْهَدُوْنَ وَلَا يَشْهَدُوْنَ قَوْمٌ هُمْ بَعْدَ ثُمَّ السَّمَنُ

'সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ, মর্যাদার বিচারে এর পরের স্থানে তাদের যুগ যারা আমার যুগের সঙ্গে মিলিত। এরপর তাদের যুগ যারা তাদের (সাহাবীদের) সঙ্গে মিলিত। এরপর তাদের যুগ যারা তাদের (তাবেঈদের) সঙ্গে মিলিত। বর্ণনাকারী বলেন, এখন আমার মনে নেই যে তিনি যুগ দুইটি উল্লেখ করেছিলেন না তিনটি। এরপর এমন এমন লোক আসবে যারা না চাইলেও সাক্ষ্য দিতে তৈরি হয়ে যাবে। খিয়ানত করবে, আমানত রক্ষা করবে না, ওয়াদা ভঙ্গ করবে, অঙ্গীকার রক্ষা করবে না। তাদের মাঝে (আদর্শিক চিন্তা-চেতনা না থাকার দরুন) ভুলতা প্রকাশ পাবে।'

হাদিস-২:

نَصِيفَهُ وَلَا أَحَدِهِمْ مُدَّ بَلَغَ مَا ذَهَبًا أُحُدٍ مِثْلَ أَنْفَقَ لَوْ أَحَدَكُمْ فَإِنْ أَصْحَابِي تَسُبُّوا لَا

'খবরদার আমার সাহাবীদের মন্দ বলো না। কেননা তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে তাহলে সেটা সাহবীদের এক মুদ অথবা আধা মুদের সমানও হবে না।' (মুদ এক কেজির কাছাকাছি একটি পরিমাণ)

হাদিস-৩:

তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন-

أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ أَحَبَّهُم فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ فَمَنْ .بَعْدِي مِنْ غَرَضًا هُمْ تَتَّخِذُوْ لَا ,أَصْحَابِ فِي الله الله يَأْخُذَهُ أَنْ فَيُوْشِكُ اللَّهُ أَذَى وَمَنْ اللَّهُ أَذَى فَقَدْ أَذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ أَذَاهُمْ وَمَنْ .أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي

'সাবধান! সাবধান আমার সাহাবীদের ব্যাপারে, আমার পরে তাদের সমালোচনার ক্ষেত্র বানিয়ো না। যে ব্যক্তি তাদের মুহাব্বত করল, সে প্রকৃত পক্ষে আমাকে মুহাব্বতের কারণেই তাদের মুহাব্বত করল।

যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল, সে মূলত আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল, যে ব্যক্তি তাদের কাউকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল। যে আমাকে কষ্ট দিল, সে আল্লাহকে কষ্ট দিল। যে ব্যক্তি আল্লাহকে কষ্ট দেবে শিগগিরই আল্লাহ তাআলা তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।'

যে ব্যক্তি তাদের মুহাব্বত করল, প্রকৃতপক্ষে আমাকে মুহাব্বতের কারণেই সে তাদের মুহাব্বত করল' বাক্যটির দুটো ব্যাখ্যা রয়েছে:
এক- সাহাবীদের প্রতি মুহাব্বত-ভালোবাসা, আমার প্রতি মুহাব্বত-ভালোবাসার আলামত, অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই তাঁদের ভালোবাসে যার অন্তরে আমার প্রতি ভালোবাসা আছে।
দুই- যে ব্যক্তি আমার কোনো সাহাবীকে ভালোবাসে, এর অর্থ সেই ব্যক্তির প্রতি আমি মুহাম্মাদের ভালোবাসা রয়েছে। একই ব্যাখ্যা বিদ্বেষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

যে ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হোক এই হাদিস তাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সতর্ক সঙ্কেত, যারা সাহাবায়ে কেরামকে স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ সমালোচনার লক্ষ বানিয়ে থাকেন, তাঁদের ব্যাপারে এমন এমন কথা বলেন বা লেখেন যার কারণে শ্রোতা বা পাঠক তাঁদের ব্যাপারে আস্থা, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। সাহাবীদের সমালোচনা করা প্রিয় নবীর নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সমতুল্য।

হাদিস-৪:
ইমাম আহমাদ (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন-

قُلُوْبًا الْأُمَّةِ اَبَرُّهَذِهِ فَإِنَّهُمْ وسلم عليه الله صلى اللهِ رَسُولِ بِأَصْحَابِ فَلْيَتَأَسَ مُتَأَسِّيًا كَانَ مَنْ وَإِقَامَةِ نَبِيِّهِ بِصُحْبَةِ اللهُ رَهُمُ إِخْتَا قَوْمٌ . حَالًا وَأَحْسَنُهَا هَدْيًا وَأَقْوَمُهَا تَكَلُّهَا أَقَلُّهَا وَ عِلْمًا وَاعْمَقُهَا الْمُسْتَقِيمِ الهُدَى عَلَى كَانُوا فَإِنَّهُمْ أَثَارَهُمْ وَاتَّبِعُوْا فَضْلَهُمْ لهُمْ فَاعْرِفُوا - دِينِهِ

'কেউ যদি কারোর আদর্শের অনুসরণ করতে চায়, তবে তার উচিৎ প্রিয় নবীর সাহাবীদের অনুসরণ করা। কারণ গোটা উম্মতের মাঝে তাঁরাই অন্তরের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি পবিত্র, জ্ঞান ও ইলমের বিষয়ে গভীরতম। লৌকিকতার বিচারে স্বল্পতম, আদর্শ, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের দিক লক্ষ করলে তাঁরা দৃঢ়তম, অবস্থার দিক দিয়ে তাঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। তাঁরা ছিলেন এমন এক কওম যাঁরা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রিয় নবীর সাহচর্যের জন্য এবং দীন প্রতিষ্ঠার জন্য মনোনীত। অতএব, তোমরা তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা জেনে রাখো এবং তাদের অনুসরণ করে চলো। কারণ তাঁরাই সরল, সোজা ও সঠিক পথে পরিচালিত।

উপরে বর্ণিত আয়াত ও হাদিসগুলোতে শুধুমাত্র সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা, তাঁদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের ঘোষণা দিয়েই শেষ করা হয়নি বরং উম্মতের প্রতি জোরালো হুকুম দেওয়া হয়েছে যেন তাঁদের আদব-সম্মান বজায় রাখে এবং তাঁদের অনুসরণ করে চলে। তাঁদের কাউকেই মন্দ বলার বিরুদ্ধে উচ্চারণ করা হয়েছে কঠোর হুশিয়ারী। তাঁদের প্রতি ভালোবাসাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে প্রিয় নবীর প্রতি ভালোবাসা হিসাবে। তাঁদের প্রতি বিদ্বেষকে গণ্য করা হয়েছে নবীজীর প্রতি বিদ্বেষ হিসাবে।

সাহাবায়ে কেরামের বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা হলো সাহাবায়ে কেরামের জন্য ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করা, তাঁদের ইজমা (ঐক্যমত) কে শরীয়তের দলীল মনে করা এবং তাঁদের অনুসরণ-অনুকরণ করা উম্মতের জন্য ওয়াজিব। তাঁদের প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ রাখা, তাঁদের সকলকে অথবা কোনো একজনকে মন্দ বলা বা সমালোচনা করা ইসলামী শরীয়তে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আরও একটি আকীদা এই যে, নবীদের মতো সাহাবীগণ মাছুম বা নিষ্পাপ নন। কিন্তু তাঁরা মাগফুর অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের ভুল-ত্রুটির ওপর অটল থাকেননি, তওবা করেছেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আমাদের করনীয়

সাহাবায়ে কেরামের কাছে আমাদের ঋণ অপরিমেয়। আমাদের কাছে হিদায়াতের আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁরা রেখেছেন অনন্য অবদান। তাঁদের প্রতি আমাদের রয়েছে সুনির্দিষ্ট করণীয়। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সাঃ) এর প্রিয় সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর এ উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন-"তাঁদেরকে চেনো, সম্মান করো এবং তাঁদের অনুসরণ করো।"

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আমাদের করণীয় হলোঃ

সাহাবীদের জীবন অধ্যয়নঃ

সাহাবায়ে কেরামের জীবন সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। সাহাবীদের জীবন সাহাবিদের সেই রোমাঞ্চকর জীবন সাম্রাজ্যে বিচরণ করতে হবে। সংগ্রহ বিস্তৃত ও ব্যাপক ব্যাপার। একেকটি জীবন যেন একেকটি জগৎ। উম্মতকে করতে হবে তা থেকে জীবন চলার পাথেয়।

সাহাবীদের জীবন সমুদ্রের তলদেশ থেকে আহরণ করতে হবে এমন সব মণিমাণিক্য-যা আমাদের করবে প্রাচর্যময় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। আজ আমরা অন্য যাদের জীবনকে মহান বলি, সাহাবিদের জীবনসমুদ্রে তাদের জীবননদীগুলো নিজেদের দীনতায় আত্মাহুতি দিয়ে নিশ্চল হয়ে যাবে।

সাহাবীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনঃ

সাহাবীদের জীবন আমাদের জন্য সম্মানের ও মর্যাদার। আমরা যখন সাহাবীদের নাম উচ্চারণ করি, তখন তাঁদের নামের শেষে পড়ি রাদিয়াল্লাহু আনহুম-মহান আল্লাহ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট। তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের থাকতে হবে সচেতন ও আন্তরিক।

সাহাবীদের জীবন অনুসরণঃ

সাহাবীদের দীপ্ত জীবন আমাদের জন্য আদর্শ। সকল যুগের উম্মতকে রাসূলে পাকের সাহাবিদের জীবন-সৌন্দর্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা অবহিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

...الْإِنْجِيلِ فِي وَمَثَلُهُمْ التَّوْرَاةِ فِي مَثَلُهُمْ ...

"তাদের গুণাবলি পেশ করা হয়েছে তাওরাতে; আরও বিধৃত হয়েছে ইনজিলে।" (সূরা আল-ফাতহ, আয়াতঃ ২৯)

সাহাবীদের এই জামাআত ছিলেন সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর অটল-অবিচল। কোনো ব্যক্তি যদি জান্নাতে যেতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই জান্নাতিদের পথ অনুসরণ করেই আগাতে হবে। আর সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছেন এমন জামাআত, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির সুসংবাদপ্রাপ্ত। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কীই-বা হতে পারে।

উপসংহার

সাহাবীগণ হলেন আল্লাহর সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সাথী এবং নবী ও রাসূলগণের পরে আল্লাহর সবচেয়ে পছন্দনীয় ও প্রিয় মানুষ। আর ঈমানের দিক থেকে তারা হলেন অগ্রগামী পূর্বপুরুষ এবং রাহমানের সন্তুষ্টি অর্জনকারী ব্যক্তিবর্গ। তাদেরকে মহব্বত করাটা আনুগত্য ও ঈমান এবং তাদেরকে ঘৃণা করাটা নিফাকী ও সীমালংঘন। তারা হলেন এ উম্মতের মধ্যে মনের দিক থেকে সবচেয়ে সুহৃদ ও সৎ মানসিকতাসম্পন্ন, ঈমানের দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী, জ্ঞানের দিক থেকে সবচেয়ে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন, প্রিয় নবি (সাঃ) এর সাহচর্য ও সহযোগিতার দিক থেকে তারা অনেক দূর এগিয়ে এবং তাদের জন্য আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রত্যয়ন ও প্রশংসার দ্বারা তাঁর মহান মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন। তাদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে সর্বোচ্চ অবস্থানে হলেন খোলাফায়ে রাশেদীনের চারজন। আর তাদের পরবর্তী পর্যায়ের হলেন 'আশারায়ে মুবাশশিরীনের (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জনের) অবশিষ্ট ছয়জন। আর তাদের পেছনে রয়েছেন পুণ্যবান মুহাজিরগণের একেবারে প্রথম ধাপের অগ্রগামী দল। তারপর আছেন প্রথম শ্রেণির আনসারগণ। তার পরবর্তী স্তরে রয়েছেন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, যারা পুরস্কারের অধিকারী এবং যাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, যারা আঘাতপ্রাপ্ত ও কঠিন পরিস্থিতির শিকার হওয়ার পরেও আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। অতঃপর 'বায়'আতে রিদওয়ান'-এ অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, যাদের জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর যিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে ঈমান এনেছেন, আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন, হিজরত করেছেন এবং জিহাদ করেছেন। অতঃপর যিনি মক্কা বিজয়ের পরে ঈমান এনেছেন, আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন, হিজরত করেছেন এবং জিহাদ করেছেন। আর তাদের সকলের জন্যই রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিশ্রুতি।

প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির ওপর ফরয হলো তাদেরকে মহব্বত করা এবং তাদের সকলের ব্যাপারে রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলে সন্তুষ্টি কামনা করা। আর যে ব্যক্তি তাদেরকে ঘৃণা করে অথবা তাদের দুর্নাম করে এবং তাদের মন্দ সমালোচনা করে, তাকে ঘৃণা করা।

গ্রন্থপঞ্জিকা

১. সাহাবায়ের কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন, ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা, জুন- ২০১৭

২. আজমতে সাহাবা, আলী হাসান উসামা, আগস্ট - ২০২৪

৩. সাহাবায়ে কিরাম আমাদের প্রেরণা, অধ্যাপক মফিজুর রহমান, অক্টোব - ২০০৫

৪. মহীয়সী নারী সাহাবীদের আলোকিত জীবন, শায়পখ মুহাম্মদ আল-মিশরী, আগস্ট - ২০১৮

৫. আশারা মুবাশশরার জীবন কথা, মুহাম্মদ আব্দুল হাই নদভী, আগস্ট - ২০২০